ধর্মীয় চিন্তা,
বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা
এবং
মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

ধর্মীয় চিন্তা, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — প্রভাস ঘোষ
(৫ আগস্ট, ২০১৫-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০১৬

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৮তম স্মরণদিবস ৫ আগস্ট, ২০১৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি আহুত নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন ইতিপূর্বে তা বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী' ও ইংরেজি মুখপত্র 'প্রোলেটারিয়ান এরা'য় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণটি এখন বই আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত ভাষণের সাথে কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই কিছু নতুন সংযোজন করেছেন। কেন মার্কসবাদ ছাড়া মেহনতি মানুষের শোষণমুক্তি ঘটবে না, এখানে তা আলোচনা করা হয়েছে।

আশা করি, সকলেই গুরুত্ব সহকারে এই বক্তব্য বিবেচনা করে দেখবেন।

জানুয়ারি, ২০১৬ **মানিক মুখার্জী**

ধর্মীয় চিন্তা,
বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা
এবং
মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে শত শত গ্রাম প্লাবিত, হাজার হাজার পরিবার প্রায় নিঃস্ব, তার মধ্যেই আজ পশ্চিমবাংলার দূরদূরান্ত থেকে আপনারা এসেছেন এবং আপনাদের মধ্যেও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত আছেন। এসেছেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি প্রবল আবেগ থেকে সুগভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর শিক্ষাগুলোকে স্মরণ করার জন্য। আমি তাঁর ছাত্র হিসাবে কয়েকটি কথা এখানে বলব। সভাপতি আমার সম্পর্কে বলেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র। সুযোগ্য কথাটার অর্থ অনেক গভীর। যত দিন বেঁচে থাকব যোগ্যতার পরীক্ষা আমাকে দিয়ে যেতে হবে, তারপর ইতিহাস বলবে সুযোগ্য ছাত্র হতে পেরেছি কি না।

এই দিনটি আমাদের ভাবাবেগকে এমন করে আলোড়িত করে যে সব কথা বলা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। কিছু কিছু ব্যথা এমন থাকে, বাইরে প্রকাশ হয়ত তেমন থাকে না, কিন্তু যতদিন যায় গভীর উপলব্ধি নিয়ে সে ব্যথা গভীরতর হতে থাকে। আমরা কর্মীদের বলি কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তক পাঠ করতে, আমরাও পড়ি, আমিও পড়ি। এই কিছু দিন আগে তাঁর একটি বক্তৃতা পড়তে গিয়ে একটা দিনের কথা স্মরণে এল। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৭৪-'৭৫ সালে ভারতবর্ষে একটানা দীর্ঘস্থায়ী উত্তাল স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র যুবদের আন্দোলন চলছিল ইন্দিরা গান্ধী শাসনের বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলন গুজরাট থেকে শুরু হয়ে সমগ্র হিন্দিভাষী এলাকায় সম্প্রসারিত হয়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহারের ছাত্ররা দুই বছর শিক্ষা বয়কট পর্যন্ত করেছিল। দাবিগুলি সবই ছিল গণতান্ত্রিক, কিন্তু বামপন্থীরা নেতৃত্বে না থাকায় দক্ষিণপন্থীরা তার সুযোগ নিচ্ছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন সম্মিলিত বামপন্থীরা যাতে নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু সিপিআই তখন প্রকাশ্যে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে, সিপিএম প্রচ্ছন্নভাবে তাঁকে সমর্থন করছে। এই অবস্থায় খুবই অসুস্থ শরীর নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ঘুরছিলেন যাতে

আন্দোলনের নেতৃত্বে বামপন্থীদের আনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা ছাড়াও অন্য কয়েকটি রাজ্যে মিটিং করে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন পুঁজিবাদবিরোধী লক্ষ্য নিয়ে গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিন গঠন করে আন্দোলন পরিচালনার জন্য, এই আন্দোলনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকেও এ কথা বুঝিয়েছিলেন। তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ খুবই অসুস্থ। ডাক্তার বলছেন, আপনি বিশ্রাম নিন, আপনি এইভাবে ঘুরবেন না। তিনি বলেছিলেন, এ দেশের গরিব মানুষকে শোষণমুক্ত করার জন্যই আমি বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত আছি। আমি বিশ্রাম নিতে পারি না। আই এগজিস্ট, আই লিভ, আই ব্রিদ ফর রেভলিউশন। আমি আছি, আমি শ্বাস-প্রশ্বাস নিই, বেঁচে থাকি বিপ্লবী সংগ্রামের জন্যই। বিশ্রাম তিনি নেননি।

কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাই আমাদের শক্তির উৎস

সিপিএম, সিপিআইকে যখন কিছুতেই রাজি করানো গেল না, তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আন্দোলনে বামপন্থী ঝান্ডা তোলার জন্য '৭৫ সালের জুন মাসে আমাদের যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও-কে দিয়ে বীরভূমের সিউড়িতে যুব সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন, যাতে এ রাজ্য থেকে ছাত্র-যুব সংগ্রাম কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে আন্দোলন শুরু করা যায়। তাঁর অনুরোধে জয়প্রকাশ নারায়ণ এসে প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। ২১ জুন প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনের ভাষণে জীবনে সেই প্রথম কমরেড ঘোষ বললেন, "দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আমি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জড়িত। তার মধ্যে ৩৩টা বছর আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ দেশে একটা নতুন ধরনের দল, সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছি। বয়স আমার খুব বেশি হয়নি। কিন্তু কর্মীদের তৈরি করার পিছনে, দলটা তৈরি করার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি ইতিমধ্যেই অসুস্থ। কিন্তু সে তো এ দেশে বিপ্লব গড়ে তোলার জন্যই। ... যেদিন আমি এই পার্টিটা শুরু করি অল্প কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে সেদিন সকলেই হেসেছে। সিপিআই তখন একটা সংগঠিত পার্টি। আমাদের দেখে বিদ্রূপ করেছে। বলেছে, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, বলেছে, চামচিকেও পাখি, এস ইউ সি আই-ও পার্টি— এদের সঙ্গেও বসতে হবে? ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই সকলেই বলেছে আমাদেরটা নাকি একটা পার্টিই নয়, একটা ক্লাব। আমাদের সঙ্গে নাকি বসাই যায় না। এসবই আমি চুপ করে সহ্য করেছি। তাদের কোনও বিদ্রূপই আমি গায়ে মাখিনি। শুধু দলটা গড়ে তোলার জন্য একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়েছি।" [১]এই বক্তৃতার শেষ দিকে বলছেন, "আমি অসুস্থ, হাঁপিয়ে উঠেছি। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর বেশি আপনাদের কাছে বলতে পারব না।"

দিনটা ছিল ২১ জুন, ১৯৭৫ সাল। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এক বছর বাদে, ৫ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৩ বছর। সেই সময় দেশে ইমারজেন্সি চলছে। যাঁদের পিছনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন গড়ে তোলার জন্য, তাদের মধ্যে আমিও একজন। আরও কয়েকজন জীবিত আছেন নেতৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে। আমাদের পিছনে যে স্বপ্ন নিয়ে তিনি এত পরিশ্রম করে নিজেকে তিল তিল ক্ষয়ের দ্বারা এত অল্প বয়সে প্রাণ হারান, আমরা কতটা তার মূল্য দিতে পেরেছি, একটা বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য কতটা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে পারছি, ইতিহাস তা বলবে, ইতিহাসের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। এই কথাই বারবার বিবেককে আলোড়িত করছে।

এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। আমি যুক্ত হই ১৯৫০ সালে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। সেদিন কী কঠিন-কঠোর সংগ্রাম এই মহান নেতাকে করতে হয়েছে, তার কিছু প্রত্যক্ষ করেছি। একটি আলোচনায় তিনি বলছেন, "গোড়াতে আমরা যখন দল গড়ার কাজ শুরু করছি, যখন সমর্থনে বিশেষ লোকজন ছিল না, যখন মাথা গোঁজার ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এ নিয়ে সেদিন কিন্তু আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এ ভাবে কেটেছে। ...আমরা কতদিন খাইনি তা নিয়ে আমরা কারও কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ মনে হত খাওয়া জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি — এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার মত কী আছে? ত্যাগের কী মাহাত্ম্য আছে?"[২]। এই যে দিনগুলো, আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। তাঁর না খাওয়ার দিন দেখেছি। আজ আমাদের দলের শক্তি প্রভাব আগের থেকে যথেষ্ট বেশি। হাজার হাজার কর্মী, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন, রাজ্যে রাজ্যে পার্টি ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে এই মুহূর্তে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা যেখানেই যাই কর্মীরা ভালবেসে, সমর্থকরা ভালবেসে সাধ্য মতো ভাল খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। একদা এই মহান শিক্ষক অনাহারে কাটিয়েছেন, ঘর জোটেনি যখন, কলকাতার ফুটপাতে, শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়েছেন। কোলে মার্কেটের ছাদে কাটিয়েছেন। আজ আমি সহ আমাদের কয়েকজন নেতা গাড়িতে চলি। যেসব কমরেডরা চাকরি করেন, তাঁরা চাঁদা তুলে গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্য একটা গাড়িরও আমরা বন্দোবস্ত করতে পারিনি। ট্রামভাড়া, বাসভাড়া সংগ্রহ করার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী ঘুরছেন, এ-ও আমি দেখেছি। তাঁর শিক্ষায় প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকি, যেন আরামপ্রিয়তার শিকার না হই। সেদিন যে

পার্টিগুলি আমাদের দলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল আজকে সেই দলগুলির চেহারা কী, আপনারা নিজেরাই দেখছেন। আর আমাদের পার্টি আজও রাস্তায় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে। ঘরে ঘরে চাঁদা সংগ্রহ করে আমাদের পার্টির কাজ চলে। সংবাদমাধ্যমে আমাদের কোনও প্রচার নেই। বিশাল বিশাল মিটিং-মিছিল করি, জনগণের দাবিতে কত লড়াই করি, কত কর্মী পুলিশ ও সরকার-আশ্রিত ক্রিমিনালদের আক্রমণে হতাহত হন, কর্মীদের রক্তে রাজপথ রক্তাক্ত হয়, কিন্তু সংবাদমাধ্যমে প্রচার থাকে না। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম ভয়ে দেয় না। কিন্তু তাতে কি আমাদের অগ্রগতি আটকাতে পারছে? ব্যাপক জনসমর্থনে আমাদের দল এগিয়ে চলেছে। এই শক্তির উৎস কোথায়? এই শক্তির উৎস মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও জীবনসংগ্রাম।

আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করে, এমনকী বামপন্থী নেতারাও করেন, অন্যান্য বামপন্থী দল ভাঙছে, তারা ছাত্র-যুবক পায় না। আপনাদের দল বাড়ছে কী করে? এত ভাল ভাল ছেলে মেয়ে আপনারা কী করে পাচ্ছেন? আপনাদের দলের কর্মীদের চোখমুখে এত প্রত্যয়, এত দৃঢ়তা, আচরণে এত ভদ্রতা, নম্রতা, এ তো অন্য কোনও দলে পাওয়া যায় না। আজকের দিনে কোথা থেকে এই শক্তি আপনারা পান? আমি একটি কথাই বলি, কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষাই হচ্ছে এই শক্তির উৎস। এই মহান নেতা ভারতের নবজাগরণ এবং স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লববাদের সুযোগ্য সন্তান হিসাবে সত্য সন্ধানের পথে পরবর্তীকালে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন এবং সংগ্রামের পথে ক্রমাগত এগিয়ে মার্কসবাদকে আরও বিকশিত করে নিজেই মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের সুযোগ্য উত্তর সাধক হিসাবে উন্নীত হয়েছিলেন এবং এ দেশের মাটিতে যথার্থ মার্কসবাদী দল গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর জীবনসংগ্রাম ও সাধনা একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়েছে আমাদের দলকে। এই স্মরণদিবসে তাঁর শিক্ষাকে যেমন আমরা স্মরণ করব, আবার তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তখনই সার্থক হবে যখন তাঁর আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করে তাঁর স্বপ্নকে সফল করার সংগ্রামে আমরা নিরন্তর নিজেদের নিযুক্ত রাখতে পারব।

বিপ্লবী জীবনই মহত্তম

কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। কোটি কোটি জানা-অজানা শোষিত মানুষের প্রতি আমাদের থাকবে অন্তরের গভীর ভালবাসা, এই ভালবাসার থেকেই আসবে বিপ্লবের প্রতি দায়বদ্ধতা। তাই বিপ্লবীরা কোনও অসুবিধাকেই অসুবিধা বলে মনে করে না, কোনও বাধাকেই বাধা বলে মনে করে না। তারা জীবনপণ করে বিপ্লবের জন্য কাজ করে যায়।

তিনি আমাদের বলেছেন, বিপ্লবী জীবনই হচ্ছে মহত্তম জীবন, মর্যাদাময় জীবন। বাকি সব জীবন মানে নিজেকে বিক্রি করা, নিজের বিবেককে বিক্রি করা। কোনও রকমে বেঁচে থাকার জন্য বা আরাম-আয়েসের জন্য মনুষ্যত্ব বর্জিত জীবনযাপন করলে পশুর সাথে মানুষের কোনও পার্থক্য থাকে না। পশুও খাদ্য সংগ্রহ করে, আশ্রয় খোঁজে, জৈবিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু পশুদের জগতে চিন্তাভাবনা নেই, বিবেক নেই, ন্যায় নীতি বোধ নেই। আর বিবেক-মনুষ্যত্ব নিয়েই মানুষ। এই মনুষ্যত্ব মানুষের জন্মের সাথে সাথে আপনা আপনি জন্ম নেয় না, মনুষ্যত্ব সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়। একটা যুগে একটা বিশেষ সময়ে সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে, সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে যে মহত্তর আদর্শ জন্ম নেয়, যে উন্নত সংস্কৃতি জন্ম নেয়, সেই আদর্শ এবং সংস্কৃতি অর্জনের সংগ্রাম থেকেই মনুষ্যত্ব গড়ে ওঠে। এজন্য তিনি বলেছেন, এ পথে আমরা এলাম কেন? বলেছেন, সমস্ত যুগে সমস্ত বড় মানুষ— যাঁরা তাঁর তাঁর যুগে সমাজ পরিবর্তনের কথা ভেবেছেন, পথ দেখিয়েছেন, তাঁরা সকলেই এই উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির অধিকারী ছিলেন, এটাই ছিল তাঁদের শক্তি ও সাধনার উৎস। দাসপ্রথার যুগে যাঁরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও মানবকল্যাণে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে নির্যাতীত হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে যাঁরা নবজাগরণের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করার জন্য বহু নির্যাতন, অত্যাচার সহ্য করেও লড়েছেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা লড়াই করেছেন, যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, যাঁরা সে যুগের বিপ্লবী ছিলেন, তাঁরা সকলেই উচ্চতর হৃদয়বৃত্তিরই অধিকারী ছিলেন। সর্বহারা বিপ্লবের যুগেও ঠিক তাই। তিনি বলেছেন, এই পথে বাধা আছে, কষ্ট আছে, অনেক আক্রমণ আছে, অনেক পরাজয় আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার ও মৃত্যুবরণের এই হচ্ছে একমাত্র পথ। ১৯৭৪ সালে কটকের ছাত্র সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, যাঁরা বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করার জন্য এগিয়ে আসে তাঁরা সবসময়ই প্রথম দিকে সংখ্যায় কম থাকে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই থাকে।

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ নয়, চাই উন্নত সংস্কৃতির আধারে বিপ্লবী নেতৃত্বে সুসংগঠিত আন্দোলন

ইতিপূর্বে আমি নিজে ও অন্য পলিটব্যুরো নেতারা এই ধরনের সমাবেশে বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাৎপর্য ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছি, ভবিষ্যতেও হবে। আজ সেই সব বিষয়ে ঢুকতে চাইছি না। শুধু এটুকু বলতে চাই, এ দেশে ও সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি-সমাজজীবন-পারিবারিক জীবন-ব্যক্তিজীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনও টোটকা ওষুধ দিয়েই বুর্জোয়া নেতারা ক্রমবর্ধমান সংকট থেকে বাঁচতে

পারছে না। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ-আন্দোলনও হচ্ছে সর্বত্র। কেউ কি ভেবেছিল, এমন করে কয়েক মাস ধরে খোদ মার্কিন দেশে হাজারে হাজারে মানুষ 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' লড়াই চালাবে, আরব দুনিয়ায় 'আরব বসন্ত আন্দোলন' হবে, ইউরোপ সহ নানা দেশে বারবার এমন ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাবে! সবকিছু সহ্যের অতীত হলে মানুষ এমনভাবেই রাস্তায় নামে। আমাদের দেশেও কম স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ হচ্ছে না। এই আন্দোলনগুলি একবার মাথা তুলছে, আবার থিতিয়ে যাচ্ছে, পুনরায় মাথা তুলে থিতিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী? কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, কোনও বিক্ষোভ-আন্দোলনই সুসংগঠিত থাকে না, লাগাতার এগোতে পারে না, উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না, যদি নেতৃত্বে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ, বিপ্লবী দল ও উন্নত সংস্কৃতি না থাকে।

এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে তত্ত্বগত চর্চা ছিল না

আমরা যখন দলে যুক্ত হই, তখন মার্কসবাদের প্রতি, কমিউনিজমের প্রতি শিক্ষিত মানুষের মধ্যে, জনগণের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ ছিল। যদিও মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের তত্ত্বগত বিষয়ে তেমন কোনও চর্চা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ থেকে এ দেশে হয়নি। কমরেড শিবদাস ঘোষই পরবর্তীকালে এদেশে প্রথম এই অপরিহার্য কাজটা খুবই গুরুত্ব দিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেদিন দলের প্রভাব কতটুকু ছিল! এমনকী আমরাও কতটা নিয়ে যেতে পারছি আজও! সেদিন অবিভক্ত সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিআই(এম) যথেষ্ট বড় দল ছিল, কিন্তু জনগণকে মার্কসবাদে সুশিক্ষিত করা দূরের কথা, নিজেরাই তত্ত্ব চর্চা প্রায় বাদ দিয়েই চলেছে। এমনিতেই আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে, স্বদেশি আন্দোলনের যুগেও, তত্ত্ব চর্চা করা, রাজনীতি বোঝা এ সবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। স্বদেশি আন্দোলনের নেতারাও সেই মনোভাব গড়ে তোলেননি। স্বাধীনতা আন্দোলনে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে, বিড়লা-টাটার ঘরের কেউ এগিয়ে আসেনি। অথচ নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রেখেছে গান্ধীজিকে সামনে রেখে বিড়লা-টাটারাই, যাতে বিপ্লব না হয়, কারণ ইতিমধ্যে রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লব হয়ে গেছে, এ জন্য তারা আতঙ্কিত ছিল। আর এদেশের জনগণের মধ্যে রাজনীতির চর্চা না থাকার ফলে জনগণ অন্ধের মতো নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে কাজ করে গেছে।

'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ' বললেই কেউ কমিউনিস্ট হয় না

পরবর্তীকালে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন জনগণ একইভাবে অন্ধের মতো সিপিআইকে সমর্থন করেছে, সিপিএমকে সমর্থন করেছে। মানুষ মনে করত ওদের পার্টির নাম যখন কমিউনিস্ট, ওরা নিজেদের মার্কসবাদী হিসাবে পরিচয় দেয়, তা হলে ওরাই কমিউনিস্ট। কে খবর রাখত যে লেনিন বলেছেন, মাকর্সবাদ

জিন্দাবাদ, কমিউনিজম জিন্দাবাদ বললেই কমিউনিস্ট হয় না, লালঝান্ডা হাতে নিলেই কমিউনিস্ট হয় না, বিচার করে বুঝতে হয়। ক'জন জানত, প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাথে মার্কস এঙ্গেলস যুক্ত ছিলেন, কিন্তু এই সংগঠন বিপথগামী হয়ে যাওয়ায় নিজেরা ভেঙে দেন। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও এঙ্গেলসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই সংগঠন অধঃপতিত হওয়ায় মার্কস-এঙ্গেলসের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড লেনিন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তুললেন। রাশিয়ার মার্কসবাদী পার্টি বলে পরিচিত আর এস ডি এল পি-র অন্যতম নেতা হিসাবে লেনিন যখন কিছুদিন পর বুঝলেন যে এ পার্টিও অ-মার্কসবাদী, অধঃপতিত হয়ে গেছে, যথার্থ মার্কসবাদী পদ্ধতিতে লেনিন আলাদা পার্টি গড়ে তুললেন এবং রাশিয়ায় প্রথম শ্রমিক বিপ্লব সফল করলেন। এ দেশে দলে দলে যারা অবিভক্ত সিপিআইয়ের পিছনে পিছনে ছুটেছে, পরবর্তীকালে সিপিএমের পিছনে পিছনে ছুটেছে, তারা এইসব ঘটনার খোঁজখবর রাখেনি, ভাবেনি, বিচার করেনি। আজকে সেই দলের অবস্থা দেখুন! সম্প্রতি সিপিএমের একজন প্রবীণ নেতার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনাদের দলের এই দুরবস্থা কেন? '৭২ সালে তো আপনারা আরও বেশি কংগ্রেসের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন, আমরাও হয়েছিলাম। তখনও তো আপনাদের এই অবস্থা দেখিনি। ৩৪টি বছর একটানা সরকার চালালেন, মাত্র একবার ভোটে হারলেন, আর তাতেই এই দুরবস্থা! উত্তর দিলেন, এতদিন সরকারে থেকে দলের পচন ধরেছে। কিন্তু সরকারি ক্ষমতায় থাকলেই কি একটি বিপ্লবী দলের পচন ধরে ? স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আমাদের দলও ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দু'বার সরকারে ছিল, আমাদের ত এতটুকু পচন ধরেনি। প্রশ্ন হচ্ছে সরকার চালানো হবে কোন শ্রেণির দৃষ্টিতে, বুর্জোয়া শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে না একটি শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দলের দৃষ্টিভঙ্গিতে ? এই প্রশ্নে তীব্র মতভেদ হয়েছিল ১৯৬৭ সালে আমাদের দলের সাথে সিপিএম, সিপিআই ও অন্যদের। কমরেড শিবদাস ঘোষ একজন সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে সেই সময়েই দেখিয়েছিলেন একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে কিভাবে একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল সরকারি ক্ষমতায় থেকে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করার স্বার্থে সরকারকে ব্যবহার করতে পারে। এটা কোনও দিনই তারা মানেননি বরং বিপরীতভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থে 'ল অ্যান্ড অর্ডার' রক্ষার নামে শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন দমনেই সরকারকে ব্যবহার করেছেন, বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার হয়ে সরকারি ক্ষমতায় থেকে অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছেন, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, আদর্শ-যুক্তির জোরে অন্যদের আকৃষ্ট করার পরিবর্তে সরকারি সুবিধার লোভ দেখিয়ে গায়ের জোরে-দাপটে, অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে ও সন্ত্রাস

চালিয়ে দল বাড়াবার পথ নিয়েছেন। আসলে মার্কসবাদী তাঁরা কোনও দিনই ছিলেন না। তবু অতীতে কিছু সংগ্রাম করতেন, আন্দোলন করতেন— পাঁচের দশকে, ছয়-সাতের দশকে। অবশ্য নির্বাচনী লক্ষ্য নিয়েই করতেন। তখনও তাঁদের কর্মীরা পুলিশের গুলির মুখে দাঁড়াত, মার খেত, জেলে যেত। আর ৩৪ বছর সরকারে থেকে এত পাওয়ার সঞ্চয় করেছেন যে, সরকার হাতছাড়া হওয়ার পর এখন আর প্রায় কোনও পাওয়ারই নেই।

এমএলএ-এমপি নয়, একটি বিপ্লবী দলের শক্তির উৎস শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আগুন

ওদের পূর্বতন জেনারেল সেক্রেটারি প্রকাশ কারাত এসেছিলেন আমাদের সাথে কথা বলতে। তাঁকে আমি বলেছিলাম, আপনারা এখনও দেশে বড় বামপন্থী দল। বামপন্থী আন্দোলনের এই সংকট কাটাতে হলে আপনারা সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে যেসব অন্যায়-ভুলভ্রান্তি করেছেন লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী অকপটে জনসমক্ষে স্বীকার করুন, সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিন, জনগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করুন এবং পুনরায় পাঁচের দশকের মতো রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম গড়ে তুলুন, মিলিট্যান্ট ক্লাস এবং মাস স্ট্রাগল সংগঠিত করুন। ওঁদের পার্টি কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানেও বলেছি, কংগ্রেস সেকুলার নয়, আঞ্চলিক বুর্জোয়া পার্টিগুলি সেকুলার নয়, ডেমোক্রেটিকও নয়। কেন এ কথা বলছি, তা ব্যাখ্যা করেছি। বামপন্থীদের জনগণের দাবির ভিত্তিতে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ওদের পার্টি কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে একথা বলেছি। বলেছি, লেনিনের শিক্ষা হল, একটা বিপ্লবী দলের শক্তির উৎস এমএলএ-এমপির সংখ্যা নয়, শক্তির উৎস শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আগুন। কিন্তু এ কথা বোঝার মন তাঁদের নেই। তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে সেকুলার শক্তি খুঁজছেন, বুর্জোয়া দলগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তি খুঁজছেন। কারণ যে ভাবেই হোক ভোটে জেতা চাই। আবার সরকারে আসতেই হবে। সরকার না পেলে তাঁদের পার্টির কোনও শক্তিই নেই। এমএলএ-এমপি না বাড়লে পার্টির ভবিষ্যৎ নেই— এমন হাল দলের! আর আমরা বলি, কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই বলি, ২৪ এপ্রিলের মিটিংয়েও বলেছি, এম এল এ-এম পি পেলে ভাল, আবার একজনও না পেলে চলবে। শুধু আমাদের চাই ক্ষুদিরামের মতো চরিত্র, ভগৎ সিংয়ের মতো অসংখ্য চরিত্র, যাঁরা প্রয়োজনে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করবেন।

মানুষের চিন্তাশীলতাকে ধ্বংস করছে পুঁজিবাদ, বুকভরা ভালবাসা দিয়ে মানুষকে জয় করতে হবে, মননশীলতা জাগাতে হবে

কিন্তু আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে জনগণ নানা সংকটে জর্জরিত, কেন এই সংকট, সেই সংকটের সমাধানের পথ কোথায়, সেটা নিয়ে তারা ভাবছে

না। গভীরভাবে চিন্তা করা, বিচার করা, বোঝা— এই মনটাই দেশের মধ্যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি নষ্ট করে দিয়েছে। চিন্তাশীলতা, মননশীলতা, যুক্তির মূল্য দেওয়া, এই যে মনটা এক সময় কিছুটা ছিল, সেই মনটাই আমাদের দেশে বিশেষ আর নেই। সমাজের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই, দেশ নিয়ে, সমাজ নিয়ে চিন্তা নেই, এমনকী পরিবার নিয়েও ভাবে না, গরিব আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তো অনেক দূরের কথা। শুধু ব্যাপকভাবে চলছে আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগসর্বস্বতা ও কুৎসিত যৌনতা। এই হচ্ছে আজকের দিনের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ সৃষ্ট নৈতিকতার সংকট, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংকটের ভয়াবহ রূপ। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে শুধু কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করলে, মিটিং মিছিল সমাবেশ করলে, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণ হতে পারে না। আজকের কাজ অনেক কঠিন। আমরা যখন রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলাম তখনও বাধা ছিল— সেটা এক ধরনের বাধা। আজকের বাধা আরও অনেক কঠিন। আমি বলেছি, একটা সময় ছিল যখন মার্কসবাদের নামেই অনেকে আকর্ষণ বোধ করত। আজ সেই দিন নেই। ফলে এখন যাঁরা বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করবেন, তাঁদের মার্কসবাদী চিন্তার আরও উন্নত স্ট্যান্ডার্ড চাই, মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানচর্চা চাই, আর চাই জীবনে উন্নত সংস্কৃতির প্রতিফলন। আজ বিপ্লবী কর্মীদের একদিকে ব্যাপক জনসংযোগ করতে হবে, যে গ্রামে থাকেন, যে পাড়ায় থাকেন, সেখানকার প্রত্যেকের অন্তরকে জয় করতে হবে। চরিত্র দিয়ে, আচরণ দিয়ে, মনুষ্যত্ব দিয়ে, বিপদে-আপদে পাশে থেকে তাদের জয় করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, একজন বিপ্লবীর অবস্থানই হচ্ছে, যেখানেই থাকে, যেখানেই কাজ করে, সেখানেই সে বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে জয় করে। এই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তাকে চিন্তা করানো, তার মননশীলতাকে জাগানো, তত্ত্ব চর্চার আগ্রহ সৃষ্টি করানো একান্ত কর্তব্য। আবার যখনই জনজীবনে সমস্যা, সংকট ও আক্রমণ হচ্ছে — সরকারি আক্রমণ হোক, কারখানার মালিকের আক্রমণ হোক, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি বা শিক্ষা ব্যবস্থার আক্রমণ হোক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকটই হোক, নারী নির্যাতন হোক — তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গভীরভাবে মার্কসবাদের চর্চা করতে হবে

আবার শুধু আন্দোলন গড়ে তুললেই হবে না, আন্দোলন চলার মধ্যে 'কেন পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব চাই', 'কেন মার্কসবাদ চাই', 'কেন সমাজতন্ত্র চাই', 'যথার্থ বিপ্লবী দল বিচারের মাপকাঠি কি', এই বক্তব্য আন্দোলনকারী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের সংকটের সাথে যুক্ত করে এমনভাবে সহজ সরল ভাষায় নিয়ে যেতে হবে, যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন। একই সাথে উন্নত নৈতিকতা অর্জনের অপরিহার্যতাও

বোঝাতে হবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে কোনও কাজই করি না কেন, এটাকে মূল লক্ষ্য হিসাবে রাখতে হবে। যদিও রাখার ফর্ম ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা হবে। এই কাজটাও করা খুবই কঠিন, আবার অবশ্যকরণীয়।

বিগত শতকের তিন থেকে ছয় দশক পর্যন্ত মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রবল আকর্ষণ ছিল। এটা আরও বেড়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লালফৌজের কাছে মানবসভ্যতার শত্রু ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইটালি ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ের ফলে। তা ছাড়া রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, উত্তর কোরিয়া জুড়ে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় সমাজতন্ত্রের সমর্থনে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় দুর্বার শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হওয়ায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশান্তি রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নেওয়ায় তখন মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি এই আকর্ষণ প্রবলভাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সংশোধনবাদী আক্রমণে ও পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটায় এবং দীর্ঘদিন ধরে মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিরামহীন কুৎসা রটনা করায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে জনমত তৈরি করা খুবই কঠিন। তাই আজকের এই সমাবেশে কেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জনগণের মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র অমোঘ হাতিয়ার এই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

আপনারা জানেন, এমনিতেই আমাদের দেশে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এখন তার প্রভাব আরও বেড়েছে। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণি, সরকারি বুর্জোয়া দলগুলি ধর্মান্ধতা বাড়াবার জন্য খুবই মদত দিচ্ছে। হতাশাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষও মুক্তির অন্য কোনও পথ না পেয়ে এদিকেই ঝুঁকছে। এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় পথে এবং বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মানুষের প্রচারিত আদর্শে বর্তমান সংকটের কেন পরিত্রাণ নেই, কেন মার্কসবাদই একমাত্র মুক্তিসংগ্রামের পথ, এটা আপনাদের বুঝতে হবে ও বোঝাতে হবে। যদিও এই অল্প সময়ের সভায় সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবুও কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক কথা আমি রাখতে চাই। এইসব বক্তব্য সাধারণত জনসভায় চর্চা হয় না, আমরা কখনও কখনও করেছি।

ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকা মার্কসবাদীরা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে

আপনাদের জানা দরকার, ধর্মীয় চিন্তা মানবসমাজে প্রথম থেকেই ছিল — এই ধারণা ভ্রান্ত, ইতিহাসে এর কোনও নজির নেই। আজও আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে যেসব আদিম জনগোষ্ঠী বাস করে, আন্দামানে যে জারোয়ারা বাস করে তারা

ঈশ্বর বলে কিছু জানে না, ভগবানের পূজা করে না। আদিম সমাজে স্থায়ী সম্পত্তি, সম্পত্তির মালিকানা, ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত এ সব আসেনি। তখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বাঁচার জন্য প্রকৃতির সাথে লড়াই করত, নানা প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করার জন্য, সন্তুষ্ট করার জন্য, নানা প্রাচীন ম্যাজিকের আশ্রয় নিত, নানা মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করত, কিন্তু কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের চিন্তা ছিল না। তাদের চিন্তা ছিল বস্তুজগতভিত্তিক। যে বিবেকানন্দকে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা শ্রদ্ধা করেন, আমরাও করি, তিনি নিজেই এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "প্রথম দিকে মানুষ বাইরে প্রকৃতির মধ্যেই বিশ্বের সত্য খুঁজেছিল। এটা ছিল বস্তুময় জগৎ থেকেই জীবনের সমস্যার সমাধান পাওয়ার চেষ্টা"।[৩] আপনাদের জানা দরকার যে, এ কথাও ঠিক নয় যে, ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে শুধু অধ্যাত্মবাদেরই চর্চা হয়েছে, বস্তুবাদের হয়নি। এ দেশের দর্শনের সিলেবাসে এখনও বস্তুবাদী দর্শন হিসাবে প্রাচীনকালের চার্বাক দর্শন, লোকায়ত দর্শন ইত্যাদি বস্তুবাদী দর্শন পড়ানো হয়। প্রথম বেদ ঋকবেদেও মূলত প্রকৃতিজগৎ নিয়েই চর্চা হয়েছে। এ কথাও আপনারা অনেকেই জানেন না, ভগবান বুদ্ধ বলে যিনি খ্যাত, তিনি নিজেই ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরও করতেন না। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ— এই পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঁচটি বস্তু থেকেই এই বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টি, এই ধারণা একদিন এ দেশে প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ ব্যোম বা আকাশ বাদ দিয়ে চতুর্ভূত বা ৪টি বস্তু দিয়ে সবকিছু তৈরি হয়েছে বিশ্বাস করতেন। বস্তুকণা দিয়ে সবকিছু সৃষ্টি এ কথা কণাদ মুনিও বলেছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের শূণ্যের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও এ দেশেই হয়েছিল।

তা বলে কি ধর্মীয় চিন্তার কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না? আমরা মার্কসবাদীরা তা মনে করি না। বরং আমরা মার্কসবাদীরা অতীতের ধর্মপ্রচারকদের গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখি, ধর্মেরও ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকাকে স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি একটা বিশেষ যুগে ধর্মই সমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে। বরং বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে যখন প্রজাতন্ত্র বা পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মনন তৈরীর জন্য রেঁনেসাস আন্দোলন করছিলেন, যখন জনগণকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করছিলেন, তখন ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বুর্জোয়া চিন্তাবিদ বেকন, হবস, লক, স্পিনোজা, কান্ট, ফুয়েরবাকরা ধর্মকে মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকারক, অসত্য ও পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য করেছিলেন। কারণ তাঁরা মানবসমাজে কেন এবং কোন সময়ে, কী প্রয়োজনে ধর্মীয় চিন্তা এল, তার উত্তর খুঁজে পাননি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসকে বিচার করে এর প্রথম উত্তর দিয়েছিলেন মহান মার্কস। কী গভীর শ্রদ্ধায় মার্কস বলেছিলেন, "ধর্মীয় দুঃখ একই সাথে প্রকৃত দুঃখেরই প্রকাশ। ধর্মীয় প্রতিবাদ অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদ। ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও হৃদয়হীন

পৃথিবীর হৃদয়, বিবেকহীন অবস্থার বিবেক"।[৪] এর পরের বাক্য সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব। মহান এঙ্গেলস বলেছেন, "খ্রিস্টান ধর্ম এবং শ্রমিক শ্রেণির সমাজতন্ত্র উভয়েই দাসত্ব ও দুঃখময় জীবনের অবসান চায়। পার্থক্য হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম মনে করে মৃত্যুর পরে স্বর্গে মুক্তি আসবে, আর সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে সেই মুক্তি এই পৃথিবীতেই সমাজ পরিবর্তনের দ্বারা আসবে।"[৫] কমরেড শিবদাস ঘোষও খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের দাসপ্রথাবিরোধী সংগ্রাম উল্লেখ করে বলেছেন, "...সমাজ বিকাশের একটা স্তরে এসে ধর্মই মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার ধারণা, মূল্যবোধ, সেবার মনোবৃত্তি, অপরকে হেয় না করা, ন্যায়-অন্যায় বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এরই ফলে সমাজে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠেছে এবং তা সমাজে সংহত বোধের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং সেই দিক থেকেও ধর্ম সমাজ প্রগতিতে সাহায্য করেছে।"[৬] ফলে দেখুন, মার্কসবাদী চিন্তানায়করা কী গভীর শ্রদ্ধায় মানবসভ্যতার এক বিশেষ স্তরে ধর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। অথচ দুঃখের বিষয়, মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এ নিয়ে কত অপপ্রচার চলে! মার্কসবাদ বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, একটা বিশেষ চিন্তা ও ভাবনা সমাজ বিকাশের একটা বিশেষস্তরে কীভাবে গড়ে ওঠে। ভাববাদীরা বা অধ্যাত্মবাদীরা মনে করে বস্তুজগৎ বহির্ভূত একটা ভাবের জগৎ থেকে কিংবা ঐশ্বরিক শক্তি থেকে মানুষের মনে চিন্তা আসে, সুপার মাইন্ড মানুষের মাইন্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে, সৎ এবং বড় মানুষদের মনে মানবকল্যাণে ঐশ্বরিক বাণী আসে। ফলে সেটা অভ্রান্ত, অলংঘনীয়, শাশ্বত সত্য। প্রাচীনকালের বস্তুবাদীরাও— বিজ্ঞানের অগ্রগতি না থাকায়—বস্তু থেকেই চিন্তা আসে, এর বেশি বলতে পারেননি। ইউরোপের নবজাগরণের যুগে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা মানুষ এবং মানুষের মস্তিষ্ককে এক ধরনের বিশেষ যন্ত্র হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের বিরুদ্ধতা করে বলেছেন, "মানুষের মনে বস্তুজগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়া ভাবনা আর কিছুই নয়"।[৭] এই সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, "The reflection of nature in man's thought must be understood ... not without contradiction, but in the ... proces of movement, the arising of contradictions and their solutions." "মানুষের চিন্তায় প্রকৃতির প্রতিফলনকে দ্বন্দ্বহীনভাবে বুঝলে চলবে না, বুঝতে হবে গতির প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বগুলি দেখা দিচ্ছে এবং তার নিরসন ঘটছে।"[৮] তাঁদের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারকে ভিত্তি করে বলেছেন, "... বস্তু যে চেতনা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে, এ বিষয়টি আজ তর্কাতীত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্ব ও বাস্তব পরিবেশ মানুষের মস্তিষ্কে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করছে, সেটাই মানুষের মস্তিষ্কের যে বিশেষ ক্ষমতা, যাকে পাওয়ার অফ ট্রানস্লেশন

অফ দি হিউম্যান ব্রেন বলা হয়— তাকে ভিত্তি করেই চিন্তা ও ভাবের জন্ম হয়েছে।"[৯] তিনি আরও বলেছেন, "মনের স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে। সেই সীমাটা দুটো জায়গায়। একটা হচ্ছে বিশেষ বাস্তব পরিবেশ। আর একটা হচ্ছে চিন্তাপ্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় একজনের চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠে, সেটা তার জানা বা অজানা থাকতে পারে। কিন্তু সেই চিন্তাপদ্ধতিই চিন্তার স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে।" [১০] তাই দেখা যায়, মূলত একই বাস্তব পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্যের জন্যই বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে, গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে নানা প্রশ্নে চিন্তার বহু পার্থক্য ছিল!

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আদিম সমাজে ঈশ্বরচিন্তা আসার বাস্তব পরিবেশ বা উপাদান ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সমাজে স্থায়ী সম্পত্তি এল, সম্পত্তির মালিকানা এল এবং দাস-দাসপ্রভু সম্পর্ক স্থাপিত হল, দাসপ্রভুদের নির্দেশে ও নির্ধারিত নিয়মে সমাজ পরিচালিত হতে থাকল, দাসপ্রভুরা নিজেদের শোষণের স্বার্থে তাদের হুকুমকেই চূড়ান্ত মনে করল এবং দাসদের পশু হিসেবে গণ্য করে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাল। এই অত্যাচারিত দাসদের কান্নাই সেই যুগের একদল বড় মানুষকে ব্যথায় উদ্বেল করেছিল। এঁরা বাস্তব জীবনে দেখলেন দাসপ্রভুর নির্দেশে ও নির্ধারিত শৃঙ্খলায় সমাজ চলছে; আবার প্রকৃতি জগতে ঋতুর পরিবর্তন, দিনরাত্রি, জোয়ার-ভাটা, প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদিও একটা নিয়মে চলছে। তা হলে এর নিশ্চয়ই পরিচালক একজন প্রভু আছে এবং তিনিই বিশ্বপ্রভু, তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই দাসপ্রভু এবং দাসেরও স্রষ্টা। ফলে তাঁর নিয়ম, তাঁর নির্দেশ দাসপ্রভুকে, দাসদের সকলকে মানতে হবে। কী তার নির্দেশ? অনেক চিন্তা করে তাঁরা যা যা পেলেন, তাঁরা সৎ বিশ্বাসে মনে করলেন এবং ঘোষণা করলেন, এগুলোই ভগবান, গড বা আল্লার নির্দেশ। তাঁরা বললেন, দাসপ্রভু ও দাস সকলেই ভগবানের সন্তান, ফলে দাসপ্রভুকেও ভগবানের শাসন মেনে চলতে হবে। এইভাবেই যে দাসপ্রথার যুগে ঈশ্বর ধারণার জন্ম হয়েছে এবং ধর্মপ্রচারকরা ধর্মীয় বাণী এনেছেন, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। আবার এও বোঝা যায় যে, ধর্মপ্রচারকদের কী অসাধারণ মানবদরদি মন ছিল এবং তাঁরা কী বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কারণ বাস্তবে যথার্থ ভগবান না থাকলেও এঁরা মানবকল্যাণে অসাধারণ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নৃশংস অত্যাচার সহ্য করে সংগ্রাম করেছেন। সেজন্যই তাঁরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধাভাজন।

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা এখন ধর্মকে 'আফিম' হিসাবে ব্যবহার করছে

দাসপ্রভুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ করল, অনেককে হত্যা করল, বহু জন অনাহারে মারা গেলেন। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস হচ্ছে, প্রথম যুগে

বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকরা অনাহারে দিন কাটিয়েছেন, তৎকালীন শাসকদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাঁদের হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু আজ তাঁদের প্রতিনিধি বলে যে ধর্মপ্রচারকরা দাবি করেন, তাঁরা এখনকার বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসাদারদের সাহায্যে ও সরকারি আনুকূল্যে বিশাল বিশাল মন্দির, মসজিদ, গির্জা স্থাপন করছেন, কত সম্পদের অধিকারী হয়ে ভোগ-বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন। প্রথম যুগের ধর্মপ্রচারকরা তাদের সময়ে সমাজে এমন কোনও অন্যায় ছিল না, যার বিরুদ্ধে লড়েননি, লড়তে গিয়ে নির্যাতন সহ্য করেননি। অথচ আজ সমাজে কত অন্যায়-অত্যাচার হচ্ছে, কত লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, ক্ষুধার্ত হয়ে আত্মহত্যা করছে, বেকারি-ছাঁটাইয়ের দুঃসহ জ্বালায় ভুগছে, শিশুকন্যা-বৃদ্ধা সহ কত নারী ধর্ষিতা হয়ে আর্তনাদ করছে, কোনও মন্দির-মসজিদ-গির্জা বা ধর্মপ্রচারকরা এর বিরুদ্ধে লড়াই তো দূরের কথা প্রতিবাদ করছেন? যুক্তির খাতিরে ভেবে দেখুন, আজ যদি যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ থাকতেন— তাঁরা কি এসব দেখে চোখ বুজে ধর্মীয় আরাধনায় মগ্ন থাকতেন, না লড়াইয়ের ডাক দিতেন! বরং যত ধর্মীয় উন্মাদনা বাড়ছে, স্বঘোষিত গডম্যানদের ভিড় বাড়ছে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, ততই দেখছি অন্যায়, অধর্মও বাড়ছে। অন্য দিকে যে পুঁজিবাদ নবজাগরণের যুগে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, আজকে প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে এসে সেই পুঁজিবাদ অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে মানুষকে নিমগ্ন রাখতে চাইছে। সেদিন ধর্ম ছিল তার শত্রু, আর আজ তার পরম মিত্র। কারণ ধর্মের মাধ্যমে গরিব মানুষকে আজ বোঝানো যায়, দুঃখ-দুর্দশা, শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়ন সবই 'বিধাতার বিধান, অদৃষ্টের লিখন', 'খোদা কি মর্জি, নসিব কি খেল'! 'পূর্বজন্মের কর্মফল', 'ধনী-গরিব বিধাতার সৃষ্টি', এ জন্মে হাসিমুখে দুঃখকষ্ট সহ্য করে গেলে পরজন্মে স্বর্গবাস হবে' ইত্যাদি বহু মিথ্যা ও অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে গরিবদের বিভ্রান্ত করা হয়। এ জন্যই মার্কসের যে কথাগুলি আগে বলেছি, তার শেষ কথা হচ্ছে, 'ধর্ম জনগণের জন্য আফিম', অর্থাৎ শোষক বুর্জোয়ারা পূর্বেকার রাজাদের মতই ধর্মকে আফিমের মতো ব্যবহার করে জনগণকে আচ্ছন্ন করছে। আরেকটি কথাও ভেবে দেখুন, আজকের দিনে যেসব সমস্যা জনজীবনকে জর্জরিত করছে, অর্থাৎ কারখানার ক্লোজার-ছাঁটাই, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি-ট্যাক্স বৃদ্ধি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ-নারী নির্যাতন ইত্যাদি কোনও সমস্যা নিয়ে কি কোনও ধর্মশাস্ত্রে কোনও আলোচনা আছে? পুঁজিবাদ কী, সাম্রাজ্যবাদ কী, সমাজতন্ত্র কী, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র কী, কোন রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা উচিত বা বিরুদ্ধতা করা উচিত ইত্যাদি নিয়ে কি বেদ-গীতা-রামায়ণ-মহাভারত-বাইবেল-কোরানে কোথাও কোনও নির্দেশ আছে? নেই, কারণ থাকা সম্ভব নয়, সেই যুগের সমাজে এ সব সমস্যা বা প্রশ্ন আসেনি। তাই ধর্মপ্রচারকদের ভাবনাতেও আসেনি।

যা কিছু তাঁরা বলেছেন, সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছেন। এজন্যই ধর্মীয় পথে আজকের দিনে জীবনের কোনও সমস্যার সমাধান নেই। বরং ধর্মীয় চিন্তাকে শোষক বুর্জোয়া শ্রেণিই তাদের শোষণব্যবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে ব্যবহার করছে। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি, যাঁরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করেন না, পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-কালোবাজারিদের তুষ্ট রেখে তাদের আর্থিক সাহায্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালান না, সেইসব সৎ ধর্ম বিশ্বাসীরা আজকের দিনের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিছুটা হলেও সামিল হবেন। আমরা এ কথাও মনে করি, যতদিন সাধারণ মানুষকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না করা যাবে, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণি শোষণ কায়েম রাখার জন্য ধর্মকে মানুষের জীবনে আফিমের মতো ব্যবহার করে যাবে, সমাজে শাসক ও শাসিতে বিভেদ থেকে যাবে, অত্যাচারিত মানুষ পার্থিব জগতে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত থাকবে, নিজেদের বাঁচার মতো জীবন গড়ে তুলতে না পারবে, যথার্থ মুক্তির পথ না পাবে, ততদিন অসহায় শোষিত জনগণ সৎ মনেই কল্পিত 'ভগবান'-এর চিন্তা আঁকড়ে থাকবে যাতে 'পরকালে' ন্যায় বিচার পায়। তাই আমরা অসহায় বিভ্রান্ত জনগণের ধর্মীয় আবেগকে আঘাত না করে তাদের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনে সামিল করিয়ে সযত্নে যুক্তির সাহায্যে সচেতন করি।

বিবেকানন্দের আদর্শ কি আজ মুক্তির পথ দেখাতে পারে

এবার বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করব। এঁরা সকলেই আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, সৎ, বড় মানুষ ও মানব কল্যাণকামী ছিলেন। আমি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ছাত্র হিসাবে যা বুঝেছি তাই বলছি। বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলার আগে বিবেকানন্দ সহ এ দেশের সকল বড় মানুষের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আরেকজন মনীষী সম্পর্কে দু'চার কথায় কিছু বলা দরকার। তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি সকল ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে 'পণ্ডিত' ও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে ইউরোপে তখন নবজাগরণের শেষ অধ্যায় চলছে, ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে তখনও লড়াই চালাচ্ছে তৎকালীন বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে যান্ত্রিক বস্তুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সেকুলার মানবতাবাদ। আর এদেশে ইংরেজ শাসন চলছে, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় অত্যাচার-নিপীড়ন চলছে, শিল্পপুঁজি সদ্য ভূমিষ্ঠ হচ্ছে বা হতে চলেছে, জাতীয় চিন্তারও কিছুটা স্ফূরণ হচ্ছে। এই পটভূমিকায় ২১ বছর বয়সে ইংরেজি শিখে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ১৮৫৩ সালে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইংরেজ সরকারকে জানালেন, "কিছু কারণে সংস্কৃত কলেজে আমরা বেদান্ত ও সাংখ্য পড়াতে বাধ্য হচ্ছি। সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিতর্কের বিষয় নয়। এই দর্শনগুলি

যতই ভ্রান্ত হোক, হিন্দুদের মধ্যে এই সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃত কোর্সে যখন এইগুলি পড়াতেই হচ্ছে, তখন এইগুলির (বেদান্ত ও সাংখ্য) বিরুদ্ধতা করার জন্য ইংরেজিতে যথার্থ দর্শন পড়াতে হবে যাতে এইগুলির প্রভাবের প্রতিষেধকরূপে কাজ করে।... যেখানেই আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের আলো পৌঁছাচ্ছে এবং যতটুকু পৌঁছেছে, সেখানে ততটুকু এ দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রের বিদ্যার প্রভাব কমছে। ফলে ইউরোপীয় এই আধুনিক শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে। ... এমন শিক্ষক চাই যারা বাংলা ভাষা বলবে, ইংরেজি ভাষা জানে এবং ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত। ... " লেখাপড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এ শিক্ষা শেষ করলে চলবে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য পড়াতে হবে ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা. নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব।[১১] — একথাও বিদ্যাসাগর বলেছিলেন। তৎকালীন সরকার এটা মানেনি। অনেকেই জানেন না যে বিদ্যাসাগর ভগবান মানতেন না, তাঁর লিখিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা না করায় প্রবল সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং ইংরেজ সরকার নিযুক্ত পর্যবেক্ষক বিশপ মার্ডক বিদ্যাসাগরকে 'র‍্যাঙ্ক মেটিরিয়ালিস্ট' আখ্যা দেন। আবার এই বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা জানাবার জন্য স্বয়ং রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যাননি, কারণ মন্দির, দেব-দেবী, পূজায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। এ সব কথা অনেকেই জানেন না। বিদ্যাসাগরের এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের কয়েক দশক পরে বিবেকানন্দের অভ্যুত্থান ঘটে। তখন ইউরোপের ও এ দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ নিয়েছে। ইউরোপে তখন ইতিমধ্যেই নবজাগরণের আগমণ ঘটেছে, পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট দেখা দিচ্ছে, শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণি রক্তাক্ত বিপ্লব করে কয়েকমাস ক্ষমতায় ছিল এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীর উদগাতা ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা হাজার হাজার শৃঙ্খলিত বন্দি শ্রমিককে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। পুঁজিবাদ তখন একচেটিয়া পুঁজির দিকে এগোচ্ছে এবং যে বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে উৎসাহিত করেছিল, তখন তারাই শ্রমিক বিপ্লবে ভীত হয়ে ধর্মীয় চিন্তার পুনরুজ্জীবন ঘটাচ্ছে। এই পরিবেশে সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে টলস্টয়ের মতো বড় মানবদরদি বললেন, সমাজের সকল সংকটের জন্য দায়ী বিজ্ঞান, শিল্পবিপ্লব — আবার ধর্মীয় চিন্তাকে চাই, অতীতে ফিরে যেতে হবে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো, 'দাও ফিরে সেই অরণ্য, লহ এ নগর'। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার জন্য এবং পুঁজিবাদী শ্রেণি শোষণের চরিত্র না বোঝার ফলে টলস্টয় ঐরকম ভাবলেন। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের একদল ধর্মবিশ্বাসী গীতা-বেদ-বেদান্তের প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রকাশ করছেন। আবার তখনও এ দেশে খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকরা প্রচার চালাচ্ছেন, ভারত অসভ্য ও বর্বরযুগে

ছিল, তারা ইউরোপ থেকে সভ্যতার আলো নিয়ে এসেছেন, শিক্ষাভিমানী এক দল ব্রাহ্মরাও সাধারণ হিন্দুদের অসভ্য গণ্য করে বিচ্ছিন্ন শহরবাসী হয়ে গেল। আর ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীদের একাংশ তখনও কোন পাপে ভারতে জন্মাল, কেন ইউরোপে জন্মাতে পারল না, এই আফশোস করে এ দেশীয় ইউরোপীয়ান বনে গেল। এভাবে এরা এই দেশ ও দেশবাসীকে আঘাত করছিল। অন্য দিকে এ দেশে তখন শিল্পপুঁজি কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে, জাতীয়তাবাদী চিন্তারও উন্মেষ ঘটছে।

বিবেকানন্দের স্বপ্ন অপূরিত থাকল কেন

এই পরিস্থিতিতে সদ্য জাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেকানন্দ বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ালেন। তাঁর মধ্য দিয়ে অপমানিত জাতীয়তাবাদ ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্রতী হয়ে প্রাচীন ভারতে মুখ ফেরাল। তিনি দেখালেন যখন ইউরোপ প্রায় জঙ্গলে ছিল, তখন ভারতে শক্তিশালী দর্শন বেদ-বেদান্তের সাধনা চলেছে। ফলে তিনি এক হাতে বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের পতাকা, আরেক হাতে জরাজীর্ণ, অকার্যকারী বেদান্তকে তুলে ধরে বললেন, 'পশ্চিম থেকে নিতে হবে বিজ্ঞান, আর পশ্চিমকে দিতে হবে বেদান্ত'। এই ভাববাদী দর্শন বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি সব প্রশ্ন ও সমস্যার উত্তর খুঁজলেন। ফলে একদিকে যেখানে বিদ্যাসাগর ভ্রান্ত দর্শন গণ্য করে যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রের প্রভাব থেকে এ দেশের মানুষের মননকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেও পরবর্তী সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ সেই বেদান্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। এই বেদান্তের ভিত্তিতে বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বললেন, "Here is the word Sristi, which expresses the universe. Mark that the word does not mean creation. I am helpless in talking English; I have to translate the Sanskrit words as best as I can. It is Sristi, projection...All the forces whether you can call them gravitation, or attraction, or repulsion, whether expressing themselves as heat, or electricity, or magnetism, are nothing but the variations of that unit energy. Whether they express themselves as thought, reflected from Antahkaran, the inner organs of man, or as action from an external organ, the unit from which they spring it what is called the Prana. Again, what is called Prana? Prana is Spandana or vibration. When all this universe shall have resolved back into its primal stage, what becomes of this infinite force? Do they think that it becomes extinct? Of course, not. If

it became extinct, what would be the cause of the next wave, because motion is going in wave forms rising, falling, rising again, falling again,... And what becomes of what you call matter? The forces permeate all matter, which all dissolve into Akasha which is the primal matter. Akasha is the primal form of matter. This Akasha vibrates under the action of Prana; and when the next Sristi is coming up, as the vibration becomes quicker, the Akasha is lashed into all these forms which we call suns, and moons, and systems...Gross matter is the last to emerge and the most external, and this gross matter had the finer matter before it. Yet we see that the whole thing has been resolved into two, but there is not yet a final unity. There is the unity of force, Prana; there is the unity of matter called Akasha. Is there any unity to be found among them again? Can they be melted into one? Our modern science is mute here, it has not yet found its way out; and it is doing so, just as it has been slowly finding the same old Prana and the same ancient Akasha, it will have to move along the same lines. The next unity is the omnipresent impersonal Being known by its old mythological name as Brahma, the four-headed Brahma, and psychologically called Mahat. This is where the two unite...At the end of a cycle, everything becomes finer and finer and is resolved back into primal state from which it sprang, and there it remains for a time, quiescent, ready to spring forth again. That is called Sristi, projection." (১২)

(" 'সৃষ্টি' এই শব্দটা বিশ্বকে ব্যক্ত করে। লক্ষ্য করুন শব্দটার দ্বারা ক্রিয়েশনকে বোঝায় না। ইংরেজিতে না বলে আমার উপায় নেই। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সংস্কৃত শব্দগুলি অনুবাদ করার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে 'সৃষ্টি', বহিঃপ্রক্ষেপ (প্রজেকশন)। সব শক্তিই (ফোর্সেস) যাদের মাধ্যাকর্ষণ বা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ যে নামেই বলা হোক অথবা তাপ, বিদ্যুৎ বা চুম্বক যেভাবেই তারা প্রকাশিত হোক না কেন, তারা সেই একক শক্তিরই বিভিন্ন রকমের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের ভেতরের অঙ্গ 'অন্তঃকরণ' থেকে ভাবনা রূপে প্রতিফলিত হোক অথবা বাইরের অঙ্গের থেকে ক্রিয়া হোক, সবেরই উৎস হচ্ছে 'প্রাণ'। আবার 'প্রাণ' কাকে বলা হয়? প্রাণ হচ্ছে স্পন্দন বা কম্পন (ভাইব্রেশন) । যখন এই সমগ্র বিশ্ব তার প্রথমিক স্তরে ফিরে যাবে তখন সেই অসীম শক্তির

কী হবে? তারা কি মনে করে ওই শক্তি বিলুপ্ত হবে? অবশ্যই নয়। এটা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী প্রবাহের কারণ কী হবে, কারণ গতি ঘটছে প্রবাহের মতো — উঠছে, নামছে, আবার উঠছে, নামছে.... তোমরা যাকে পদার্থ বল, তার কী হয়? শক্তি সমূহ যে সকল পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেই পদার্থগুলি 'আকাশে' বিলীন হয় যা পদার্থের মূল উৎস। 'আকাশই' হচ্ছে পদার্থের আদি রূপ (প্রাইমাল)। প্রাণের ক্রিয়ায় আকাশ কম্পিত হয়, এই কম্পন দ্রুততর হওয়ায় পরবর্তী 'সৃষ্টি' আসতে থাকে এবং যাকে আমরা সূর্য, চন্দ্র এবং ব্যবস্থাসমূহ (সিস্টেমস) বলি, আকাশ প্রবল বেগে এসবে রূপান্তরিত হয় (ল্যাশড ইনটু)। .... প্রথমে পদার্থ সূক্ষ্মতর থাকে, তারপর স্থূল ও স্থূলতর পদার্থ আবির্ভূত হয় এবং যেটা সবচেয়ে বেশি (একসট্রিম) বাহ্যত প্রকাশিত হয়। তবুও আমরা দেখছি সবকিছু দুটিতে মিশছে, (রিজলভড) কিন্তু তবুও চূড়ান্ত ঐক্য হচ্ছে না। শক্তির ঐক্য হচ্ছে 'প্রাণে', পদার্থের ঐক্য হচ্ছে 'আকাশে' কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি কোনও ঐক্য পাওয়া যায়? উভয়ে কি একটিতে মিশতে পারে? আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে নীরব এবং এখনও পথ খুঁজে পায়নি, চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন করে ধীরে ধীরে সেই পুরানো 'প্রাণ' ও সেই প্রাচীন 'আকাশ' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তাকে এই লাইনেই এগোতে হবে। পরবর্তী ঐক্য হচ্ছে সর্বত্র বিরাজমান বিমূর্ত সত্তা, যাকে পুরাকাহিনীতে 'ব্রহ্মা' নামে বলা হয়, চার মাথা বিশিষ্ট 'ব্রহ্মা', যাকে মনস্তাত্তিক দিক থেকে 'মহৎ' বলা হয়। এখানেই উভয়ে (প্রাণ ও আকাশ) ঐক্যবদ্ধ হয়.... একটি চক্রের শেষে (সাইকল) সবকিছু সূক্ষ থেকে সূক্ষতর হতে হতে আদি অবস্থায় ফিরে যায়, সেখানে কিছু সময় থাকে সক্রিয় অবস্থায় পুনরায় আবির্ভূত হওয়ার জন্য। এটাকেই বলা হয় 'সৃষ্টি', বহিঃপ্রক্ষেপণ (প্রজেকশন)"।)

এর দ্বারা বিবেকানন্দ বললেন, 'চিরন্তন ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য,' বাকি সবই তাঁর প্রকাশ মাত্র। তাঁর মতে আকাশ হচ্ছে বস্তু এবং প্রাণ হচ্ছে এনার্জি, উভয়েই ব্রহ্ম বা মহৎ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। শুরুর দিকে উভয়েই সূক্ষ্ম থাকে। তারপর প্রাণ আকাশের সংস্পর্শে আসে এবং স্পন্দন সৃষ্টি করে। তারপর আকাশ বা বস্তু বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। এভাবেই সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্যরা এসেছে। পুনরায় আকাশ ও প্রাণ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। এভাবেই চক্রাকারে ঘুরেফিরে আসে ও যায়। ফলে এই জগতের সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত। আকাশ ও প্রাণ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্ম থেকে বৃহৎ হয়, পুনরায় সূক্ষ্ম হয়ে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়, আবার আসে ও যায়। এই প্রক্রিয়ার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। ফলে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না। যদিও সবটা এক নয়, তবুও এই প্রসঙ্গে ইউরোপের ভাববাদী দার্শনিক হেগেলের চিন্তার আমি উল্লেখ করতে চাই। হেগেলের চিন্তা কি ছিল তা আমি মহান এঙ্গেলসের ভাষায় বলছি। এঙ্গেলস বলেছেন, "With Hegel ... for what we cognize in the real world is

precisely its thought content that which makes the world a gradual realization of the absolute idea which absolute idea has existed somewhere from eternity, independent of the world and before the world... According to him, nature, as a mere 'alienation'of the idea is incapable of development in time, capable only extending its manifoldness in space, so that it displays simeltaneously and alongside of the another all the stages of development comprised in it, and is condemned to an eternal repeatation of the same process."[১৩] এর অর্থ দাঁড়ায় হেগেলের মতে 'অ্যাবসলিউট আইডিয়া' অনন্তকাল ধরে বিশ্বের আগে থেকেই এবং বিশ্ব থেকে স্বাধীনভাবে বিরাজ করছে এবং এখান থেকেই বিশ্বজগৎ এসেছে। এই বিশ্বে নতুন কোনও বিকাশ বা পরিবর্তন হচ্ছে না, পূর্বনির্ধারিত অবস্থায় এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সবকিছুর পরিবর্তন 'অ্যাবসলিউট আইডিয়া'র মধ্যে নিহিত থাকে, সেটা প্রকাশিত হতে থাকে আবার 'অ্যাবসলিউট আইডিয়া'য় ফিরে যায়, বারবার এটার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। হেগেলের কাছে যেটা 'অ্যাবসলিউট আইডিয়া', বিবেকানন্দের কাছে সেটাই পরম ব্রহ্ম বা মহৎ। পার্থক্য হচ্ছে বিবেকানন্দ কিছুটা সাংখ্য দর্শনের 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'র মতোই 'আকাশ' ও 'প্রাণে'র চিন্তা করেছিলেন, আবার তিনি বলেছেন 'মহৎ' থেকেই উভয়ের উৎপত্তি হয়েছে। এবার আপনারা বিচার করে দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী আবিষ্কারের আলোকে প্রকৃতি জগত সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই বিশ্লেষণকে কি যুক্তিগ্রাহ্য বলা চলে ?

পশ্চিমের সমাজতন্ত্রের ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবেকানন্দও তাঁর মতো করে শূদ্র বা শ্রমিকের শাসন ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হবে এই ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ এভাবে ব্যাখ্যা না করে ভারতে বহু কাল থেকে প্রচলিত বর্ণভেদের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, "Human society in turn is governed by the four castes — the priests, the soldiers, the traders and the labourers... Last will come the labourers' (sudras) rule. Its advantages will be the distribution of physical comforts — its disadvantages (perhaps) the lowering culture. There will be great distribution of ordinary culture, but extraordinery geniuses will be less and less." [১৪] ("মানবসমাজ পর্যায়ক্রমে চারটি বর্ণ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়), বৈশ্য এবং শ্রমিক দ্বারা শাসিত হয় ... সর্বশেষে শ্রমিকের (শূদ্রের) শাসন আসবে। এর সুবিধা হচ্ছে দৈহিক ভোগের বন্টন আর অসুবিধা (সম্ভবত) হচ্ছে সংস্কৃতির অবনমন। সাধারণ সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবানরা কমতে থাকবেন।") শ্রমিক শ্রেণির শাসন বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজবিকাশের নিয়মকে অনুধাবন করে গড়ে ওঠেনি। সেই সময় ইউরোপে

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নানা কাল্পনিক ধারণার চর্চা চলছিল, তার দ্বারাই তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। লক্ষণীয় তিনি বলেছেন, শ্রমিক শাসনে physical comforts-এর বন্টনের সুবিধা হলেও সংস্কৃতির মান নিম্নগামী হবে এবং অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ কমে যাবে। বোঝা যায়, বুদ্ধির শক্তি ও শ্রমশক্তির পার্থক্য চিরন্তন এই প্রচলিত ধারণা তাঁর মধ্যেও কাজ করেছে। তাঁর ক্রিয়েশন তত্ত্ব অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র শাসন চক্রের মতো বারবার ঘুরে ফিরে আসবে। অর্থাৎ ধরে নিতে হয়, আদিম সমাজ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বারবার ঘুরে ফিরে মানব সমাজে আসবে। তাঁর এই চিন্তাও কি ইতিহাসসম্মত ও গ্রহণযোগ্য?

এবার দেখুন, অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী হয়ে অতবড় মানুষের মধ্যে কী বিপত্তি সৃষ্টি হল। একদিকে এক বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রশংসা করে বলছেন, "ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কী, তা আমরা জানি। আর ইহাও জানি যে উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদদের কীরূপ ক্ষতি করিয়াছে, যেমন এক-একটি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, ..." [১৫] অন্য দিকে আরেক বিবেকানন্দ বলছেন, "We say Newton discovered gravitation. Was it sitting anywhere in a corner waiting for him! It was in his own mind, the time came and he found it out. All knowledge that the world has ever received comes from the mind. The external world is simply the suggestion, the occasion, which sets you to study your own mind. The falling of an apple gave the suggestion to Newton, and he studied his own mind. He rearranged all the previous links of thought in his mind and discovered a new link among them, which we call the law of gravitation."। ("আমরা যে বলি নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল, সে কি কোনও ঘরের কোনায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল? মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব তাঁর মনের ভেতরেই ছিল, যখন সময় হয়েছে তখনই তিনি তাকে দেখতে পেয়েছেন। বিশ্ব আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান আহরণ করেছে সবই এসেছে মনের ভেতর থেকে। তোমার মনের অভ্যন্তরেই বিশ্বের অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে। বহির্জগত হচ্ছে শুধুমাত্র ভাবনার উপকরণ (suggestion), একটা ঘটনা (occasion), যেটা তোমার মনকে বিচারে নিয়োজিত করে। আপেল পড়ার ঘটনা নিউটনের কাছে ভাবনার উপকরণ হিসাবে আসে। তিনি নিজের মনকে বিচার করেন। তাঁর মনের অভ্যন্তরে পূর্বের থেকেই যে চিন্তার গ্রন্থিগুলি ছিল, সেগুলি তিনি পুনর্গ্রন্থিত করেন এবং তাদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক আবিষ্কার করেন — যাকেই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব"[১৬]।) বিবেকানন্দের এই বিচারধারা অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব দশ হাজার বছর আগেও যে কেউ আবিষ্কার করতে পারতেন। গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক,

হাইজেনবার্গ হতে শুরু করে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র রায়-সত্যেন বসু-মেঘনাদ সাহা-সি ভি রমন সহ অনেকেরই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কিংবা আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণা, মানবতাবাদী চিন্তা, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি হতে শুরু করে সমাজতন্ত্রের ধারণা সবকিছুই আদিম সমাজে, দাস প্রথার যুগে ঘটতে পারত বা সক্রেটিস, প্লেটো, যিশু, শংকরাচার্যরা আবিষ্কার করতে পারতেন! শুধুমাত্র আপেল পড়ার মতো একটা উপকরণের দরকার হত। একবার ভেবে দেখুন, এটা কি বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তা? যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মা পরমাত্মার বা ব্রহ্মের অংশ যা সকলের মধ্যেই অবস্থান করে, আর পরম ব্রহ্মই পরম সত্য, যা শ্বাশ্বত, সনাতন, আদি অনন্তকাল ধরে এই পরম সত্য সকলের মধ্যে অবস্থান করছে, ফলে নতুন কোনও সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে না। চিরন্তন সত্য সকলের মনেই অবস্থান করছে। তাই তিনি বলেছেন, "knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside, it is all inside. Education is the manifesta-tion of the perfection already in man [17]। ("কোন জ্ঞানই বাইরের থেকে আসে না, মানুষের মধ্যেই তা অন্তর্নিহিত থাকে। মানুষের ভেতরে ইতিমধ্যেই যে পরিপূর্ণতা (পারফেকশান) থাকে, শিক্ষা তারই প্রকাশ (ম্যানিফেস্টেশন) মাত্র।"

আবার দেখুন, এক অসাধারণ মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, ক্ষুধার্ত মানুষের কান্নায় বিচলিত হয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধনীদের ধিক্কার জানিয়ে বলছেন, "লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষা লাভ করে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা এই দরিদ্রদের কথা একটি বার চিন্তা করার অবসর পায় না, আমি তাদের বিশ্বাসঘাতক বলি। যতদিন ভারতের কোটি কোটি মানুষ অজ্ঞানতায় ডুবে থাকবে, ততদিন তাদের পয়সায় নিশ্চিন্ত অথচ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না, এরকম প্রত্যেকটি লোককে আমি দেশদ্রোহী মনে করি" [১৮]। তিনি আরও বলেছেন, 'ভারতের কোটি কোটি দুঃস্থ মানুষ তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে চাইছে রুটি, তারা আমাদের কাছে রুটি চাইছে, আর আমরা তাদের পাথর দিচ্ছি। অনাহারী মানুষকে ধর্ম শেখানো বা দর্শনশাস্ত্র বোঝানো তাদের অপমান করা। ... যতদিন ভারতবর্ষের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা পামর বলি।"[১৯]। ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গভীর বেদনায় তিনি এই ধরনের অনেক উক্তি করেছেন।

আবার অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী সেই বিবেকানন্দই ১৮৯৭ সালে লাহোরে বক্তৃতায় বলছেন, "Whether you know it or not, through all hands you work, through all feet you move, you are the king enjoing in the palace, you are the beggar leading that miserable existence in the street; you are in the ignorant as well as in the learned, you are in the man who is weak, and you are in the strong; ... That is why I do not even care whether I have to starve, because there will be millions of millions eating at the same time, and they are all mine. Therefore I should not care what becomes of me and mine, for the whole universe is mine, I am enjoying all the bliss at the same time ... herein is morality, here, in Adwaita alone, is morality explained."। ("তুমি জানো আর না জানো, যত পা হাঁটছে, যত হাত কাজ করছে, সবার মধ্যেই তুমি আছ; যে রাজা রাজপ্রসাদ ভোগ করছে, তার মধ্যে তুমি আছ, যে ভিখারি রাস্তায় দুর্দশায় আছে, তার মধ্যেও তুমি আছ। তুমি শিক্ষিতের মধ্যেও আছ, যে অশিক্ষিত তার মধ্যেও আছ এবং যে দুর্বল তার মধ্যেও আছ, যে সবল তার মধ্যেও তুমি আছ। ...এই জন্যই এমনকি আমাকে যে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতে হবে তা আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। কারণ আমি যখন ক্ষুধার্ত, তখনই সেই আমিই আরও লক্ষ লক্ষ মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করছি। এই সকলের মুখ তো আমারই মুখ। শুধু আমার কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আমার একদম ভাবা উচিত নয়। কারণ গোটা বিশ্বই হচ্ছে আমি। একই সময়ে সকল আনন্দ উপভোগ করছি। ....এখানেই আছে নৈতিকতা। একমাত্র অদ্বৈত (বেদান্ত) দ্বারাই নৈতিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"[২০]) এক মানবদরদি বিবেকানন্দকে বিরুদ্ধতা করছেন অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী আরেক বিবেকানন্দ। কারণ অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র পরম ব্রহ্মই সত্য, সকলের মধ্যেই বিরাজমান, ফলে রাজা ও ভিখারি, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, দুর্বল ও সবল, ভুরিভোজনে লিপ্ত ও ক্ষুধার্তের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, কারণ সকলেই এক ও অদ্বিতীয়। ফলে কারওরই তো কোনও সমস্যাই থাকতে পারে না। অর্থাৎ এক জাতীয়তাবাদী মানবদরদি বিবেকানন্দ বাস্তব সমাজের শোষণ-দারিদ্র দেখে সিংহগর্জনে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলছেন, আবার অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে আবদ্ধ আরেক বিবেকানন্দ বলছেন, 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য', ফলে বাস্তবে দুঃখ কষ্ট বলে কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় এত বড় মহান ব্যক্তির কী ট্র্যাজিক পরিণতি! এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ভগিনী নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি বিবেকানন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তিনিও রামকৃষ্ণ মিশনে যুক্ত না হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের অধিনায়ক শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, স্কুলের সিনিয়ার ছাত্র হিসাবে তাঁরা

কয়েকজন বন্ধু বিবেকানন্দের কাছে গিয়ে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, পরাধীন দেশে ধর্মচর্চা সন্ন্যাসী হওয়া নয়, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করাই একমাত্র ধর্মচর্চা। এভাবে বিবেকানন্দ বহু যুবককে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এটা চিন্তা করা অস্বাভাবিক নয় যে তিনি যদি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিই হয়ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর দেশাত্মবোধক আহ্বান বহু যুবককে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করেছিল, যাঁরা পরবর্তীকালে গীতা হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ করতেন। এভাবেই আবার আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে, যাকে গান্ধীজি আরও শক্তিশালী করেন এবং তার সাথে নিজের সশস্ত্র বিপ্লববিরোধী বা 'অহিংসা'র ধারণা যুক্ত করেন। শোনা যায়, চতুর্দিকের বেদনাদায়ক পরিস্থিতি দেখে এবং তাঁর স্বপ্ন সফল না হওয়ায় মৃত্যুর আগে বিবেকানন্দ খুবই দুঃখ প্রকাশ করতেন। এটা ঠিক যে, তিনি যদি বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও সংগ্রামকে বহন করতেন, তা হলে ভারতবর্ষ অন্য এক বিবেকানন্দকে পেত, দেশের পরিস্থিতিও অন্যরকম হত। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই বলছি, বিবেকানন্দের এসব চিন্তার দ্বারা কি দেশের বর্তমান সঙ্কটের সমাধান হতে পারে?

গান্ধীবাদ কি আমাদের জীবনের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারে ?

এবার গান্ধীজির চিন্তাকে বিচার করে দেখুন। গান্ধীজি তাঁর চিন্তা-ভাবনার উৎস সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, "আমি যা কিছু বলছি তা হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী। ভগবানের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই, আমার এই দাবি নতুন নয়। ... আমি যখন এই কণ্ঠস্বর শুনছি, তখন আমি স্বপ্ন দেখছি না। এই কণ্ঠস্বর শোনার আগে আমার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়। অকস্মাৎ এই কণ্ঠস্বর আমার মধ্যে আসে। ... নিশ্চিত হই যে, এই সেই কণ্ঠস্বর। ... এটা মধ্য রাতে ১১-১২টার মধ্যে ঘটে। আমি আরাম বোধ করি এবং এ সম্পর্কে নোট লিখতে শুরু করি, যেটা পাঠকেরা দেখেছেন। ... সংশয়বাদীদের বোঝাবার মতো আর কোনও সাক্ষ্য আমার নেই। ... কিন্তু আমি এটা বলতে পারি যে, যদি সমগ্র বিশ্ব সর্বসম্মত হয়ে এর বিরুদ্ধে রায় দেয়, তা হলেও এ যে ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনেছি, আমার এই বিশ্বাস টলাতে পারবে না।"[২১]

দেখুন বিংশ শতাব্দীতে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গান্ধীজির মতো মানুষ কী বলছেন? কারণ তিনিও বিশ্বাস করতেন, মাইন্ডকে সুপারমাইন্ড চালায়, সৎ মনে আরাধনা করলে ভগবানের বাণী পাওয়া যায়। তাই নন-ভায়োলেন্সকে ভগবানের বাণী গণ্য করেই তিনি বলেছেন, "এমনকী আমাকে যদি নিশ্চয়তা দেওয়া হত যে, সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই স্বাধীনতা আসবে, আমি সেটা প্রত্যাখ্যান

করতাম। কারণ সেটা যথার্থ স্বাধীনতা হত না"[২২]। এ জন্যই তিনি সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিংয়ের সশস্ত্র বিপ্লববাদকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকেও বেশি বিপদ গণ্য করে চরম বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিচারধারা অগ্রাহ্য করেছিলেন, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ব্যক্তির চিন্তা যে কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তা হতে বাধ্য, এটাও অগ্রাহ্য করেছিলেন। সৎ মন সত্ত্বেও বুঝতেই পারেননি যে সেই সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রেণিবিভক্ত ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রমিক বিপ্লব ভীতি জনিত শ্রেণি স্বার্থ থেকেই তাঁর মধ্যে তাঁরই অজ্ঞাতসারে ধর্মান্ধতা ও সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধিতা জন্ম নিয়েছে— যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ পরবর্তীকালে দেখিয়েছিলেন। আবার দেখুন, ভগবানের বাণী হিসাবেই গান্ধীজি বলেছেন, "ভগবান মালিককেও সৃষ্টি করেছেন, শ্রমিকদেরও সৃষ্টি করেছেন। মালিক হচ্ছে বুদ্ধির শক্তি, আর শ্রমিক হচ্ছে শ্রম শক্তি। ... ধনীর কাছে তার সম্পদ থাকবে, যা থেকে তার নিজের যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন অনুযায়ী সে ব্যবহার করবে। বাকি অংশের ট্রাস্টি হিসাবে মালিক থাকবে সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য। ...একটা জাতি ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া নিজস্ব সম্পত্তি করতে পারে না। তাকে শুধু দেখতে হয়, যাতে এই সম্পত্তির অপব্যবহার না হয়, ন্যায় ও সঠিক পথে তা যেন ব্যবহৃত হয়। ...পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আমার কোনও বিদ্বেষ নেই, ...আমি তাদের হৃদয় দ্রবীভূত করতে চাই, যাতে তারা তাদের কম ভাগ্যবান ভাইদের জন্য কিছু ন্যায়সঙ্গত কাজ করে। ... আমি পুঁজিপতি ও জমিদারদের অহিংসার পথে পাল্টাতে চাই। ফলে আমার কাছে শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্যতা নেই। ... আমাদের সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ হবে অহিংসার ভিত্তিতে এবং মালিক ও শ্রমিকের, জমিদার ও খাজনা দানকারীদের সম্প্রীতিমূলক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে"।[২৩] তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এক অভিনব ধারণা ব্যক্ত করে বলেছেন, "Socialism is a beautiful word, and so far as I am aware, in socialism all the members of society are equal— none high, none low. In the individual body, the head is not high because it is the top of the body, nor are the soles of the feet low because they touch the earth. Even as members of the individual body are equal, so are the members of the society. This is socialism. In it, the prince and the peasants, the welthy and the poor, the employer and the employee are all on the same level." [২৪]। ("সমাজতন্ত্র সুন্দর কথা এবং আমি যতদূর জানি সমাজতন্ত্রে সমাজের সকল সদস্যই সমান — কেউই উঁচু নয়, কেউই নিচু নয়। একজন ব্যক্তির দেহে মস্তিষ্ক ঊর্ধ্বে আছে বলে এটা উঁচু নয়, আবার পায়ের তলা মাটি স্পর্শ করে বলে নিচু নয়। দেহের সকল অঙ্গ যেমন সমান, তেমনি সমাজের সকল সদস্যই সমান। এটাই হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই ব্যবস্থার মধ্যে রাজপুত্র ও কৃষক, ধনী ও গরিব, মালিক ও শ্রমিক সকলেই একই স্তরে

আছে।"গান্ধীজি কল্পিত এই সমাজতন্ত্রই আজ দেশে চলছে, যেখানে কোটিপতি ও ভিখারি, ধনী ও গরিব, মালিক ও শ্রমিক, জোতদার থেকে খেতমজুর সকলেই মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো একই সমাজের সদস্য। সারা জীবন গান্ধীজি এসব চিন্তাকে ভগবানের বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে কাজ করে গেছেন এবং জাতির কল্যাণের নামে নিজের অজ্ঞাতসারে পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করে গেছেন। আপনারাই বিচার করে দেখুন, গান্ধীজি-আকাঙ্ক্ষিত অহিংসার পথে পুঁজিপতিদের 'হৃদয়' কতটা দ্রবীভূত হয়েছে, 'সম্পদের' কতটা তারা নিজেদের 'যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন' অনুযায়ী ব্যবহার করছে এবং কত 'বাকি অংশ' 'কম ভাগ্যবান ভাইদের' জন্য 'কাজে ব্যবহার করছে'! এবার বিচার করে দেখুন, গান্ধীবাদের দ্বারা দেশের পুঁজিবাদী শোষণের অবসান হতে পারে কি?

রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মানুষও আটকে গেলেন ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং শাশ্বত সত্যের ধারণা থেকে মুক্ত হতে না পারায় আরেকজন বড় মানুষ রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজির তুলনায় রক্ষণশীলতা মুক্ত, উদার ও মুক্তমনা হওয়া সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারলেন না। মহান মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ শোষিত মানুষের জন্য তীব্র বেদনা অনুভব করে লিখছেন, "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে। তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হওয়ার সময় নেই। দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে। ... কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে, ... সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে"। [২৫] আবার এই রবীন্দ্রনাথই লিখছেন, "আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি। মনে হয়েছে, এর কোনও উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর এক দল উপরে থাকতেই পারে না। অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না, কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। আমি শুধু ভেবেছি যারা শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর ও মনের গতিকে নিচের তলার কাজ করতে বাধ্য ও সেই কাজেরই যোগ্য, এদের জন্য যথাসম্ভব শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সুখ-সুবিধার চেষ্টা করা উচিত।"[২৬] গান্ধীজি যেমন বলছেন, "ভগবান মালিককেও সৃষ্টি করেছেন, শ্রমিকদেরও সৃষ্টি করেছেন। মালিক হচ্ছে বুদ্ধির শক্তি আর শ্রমিক হচ্ছে শ্রম শক্তি", তেমনই রবীন্দ্রনাথও বলছেন, "একদল

নিচু তলায় না থাকলে, আর একদল উপরে থাকতেই পারে না। অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। ... সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। ... যারা শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর ও মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য ও সেই কাজেরই যোগ্য। ..." অর্থাৎ দু'জনেই একমত যে সমাজে বুদ্ধির শক্তি ও শ্রমশক্তির পার্থক্য চিরন্তন। শ্রমশক্তি 'শরীর ও মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য ও সেই কাজেরই যোগ্য'। বুদ্ধির শক্তি না থাকলে 'সম্পদ' ও 'সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল' ফলবে না। অন্যদিকে রাশিয়ায় মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে শ্রমিক শ্রেণির যে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩০ সালে পরিদর্শন করে উদার, গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ চিত্তে লিখছেন, " ...একদিন ফরাসি বিদ্রোহ ঘটেছিল অসাম্যের তাড়নায়।... এই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য, সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু তা টিঁকলো না। এদের এখানকার বাণীও বিশ্বরূপী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক সামাজিক স্বার্থের উপরেই সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা করছে। ... জগৎ জুড়ে ওদের প্রতিকূলতা সবাই এদের বিরোধী। ... হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরটা বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ। ... পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়ে না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত। ...আপাতত রাশিয়ায় এসেছি — না হলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"[২৭] পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ করে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতবড় আশা ব্যক্ত করলেন! আবার সেই রবীন্দ্রনাথই পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে লিখছেন, "সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের ভাষা, ব্যক্তির যদি সম্পত্তি না থাকে, অর্থাৎ ব্যক্তির হাতে যদি সম্পদের মালিকানা না থাকে, তা হলে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। ...ব্যক্তির সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরে তার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।"[২৮] ফলে গান্ধীজি যেমন পুঁজিপতিদের বলছেন, "ধনীর কাছে সম্পদ থাকবে, সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে...নিজের যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন অনুযায়ী যতটা প্রয়োজন সম্পদ নেবে, ...বাকি অংশ সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য থাকবে", তেমনি রবীন্দ্রনাথও বলছেন, "ব্যক্তির সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরে তার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছেড়ে দিতে হবে"।

আমি আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী হলেও গান্ধীজির তুলনায় অনেক উদার ও যুক্তিবাদী ছিলেন। বড় মানুষ বলেই ৮০তম জন্মদিনের ভাষণে

বলেছিলেন, "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। (সভ্যতার সংকট — জন্মবার্ষিকী সংস্করণ, ১৭শ খণ্ড) তিনি মূলত 'আর্ট ফর আর্টস সেইক'-এর গণ্ডির মধ্যে থেকেও শেষ জীবনে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি 'পৃথিবী', 'ঐকতান', 'আফ্রিকা', 'ওরা কাজ করে' এসব কবিতা রচনা করেছিলেন। তিনি 'আফ্রিকা' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনা করে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের প্রতি আশা ব্যক্ত করেছিলেন। সারা জীবন 'অহিংস আন্দোলনে'র সমর্থক থেকেও শেষ জীবনে লিখেছিলেন, "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। বিদায় নেবার আগে তাই, ডাক দিয়ে যাই, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে"। 'ঐকতান' কবিতায় গভীর বেদনার সাথে রবীন্দ্রনাথ নিজের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে আক্ষেপের সাথে লিখেছিলেন, "আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি আমার বাঁশীর সুরে তারা জাগিবে তখনি — এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক, রয়ে গেছে ফাঁক।... পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার, বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার, চাষী খেতে চালাইতেছে হাল, তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল। বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, তারই পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার। অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে। ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"

তাঁর মতো বড় মানুষ কত দুঃখে এই কথাগুলি লিখেছিলেন, বোঝা যায়। তাঁর একটা সীমাবদ্ধতা তিনি বুঝেছিলেন, সেটা হচ্ছে তাঁর সম্পদশালী অভিজাত জীবনযাত্রা। কিন্তু আরেকটা তিনি ধরতে পারেননি সেটা হচ্ছে সত্যানুসন্ধানে, সমস্যা বিচারে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকা এবং শ্রেণি বিভক্ত সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তায় যে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেই সত্য ধরতে না পারা। তাই বিচারের ক্ষেত্রে ভাববাদ, শাশ্বত সত্যের ধারণা ও ঐতিহ্যবাদের পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি আবদ্ধ থেকে গেলেন। অসাধারণ প্রতিভা ও মানবদরদী মনের অধিকারী হয়েও তিনি এখানে আটকে গেলেন। এইজন্যই বিদ্যাসাগরের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেও বিদ্যাসাগরের মহান আদর্শ ও সংগ্রামকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে পারেননি, যেটা সুনিপুণ শিল্পশৈলীতে বলিষ্ঠভাবে করেছেন বস্তুবাদী, সেক্যুলার মানবতাবাদী ও আপসহীন সংগ্রামী মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র।

যাই হোক, গান্ধীজির তুলনায় অনেক বেশি উদার, মুক্তমনা ও যুক্তিবাদী,

হয়েও রবীন্দ্রনাথ 'এথিক্স অ্যান্ড মরালিটি'র প্রশ্নে গান্ধীজির মতোই বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার পরিমণ্ডলেই থেকে গেলেন। ইতিপূর্বে ইউরোপের সেক্যুলার মানবতাবাদী ফ্যুয়েরবাখও একই ধারণা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "rational self-restraint with regard to ourselves and love again love in our relations with others." এর অর্থ হচ্ছে নিজেদের জন্য থাকবে যুক্তিসঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণ আর অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে থাকবে ভালবাসা, শুধুই ভালবাসা। তাঁর কল্পিত এই ব্যক্তি কোনও বিশেষ সময়ের, কোনও শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়, সবকিছুর ঊর্ধ্বে abstract human being। এই মানবতাবাদী নৈতিকতাকে ফুয়েরবাক চিরন্তন গণ্য করেছেন। এই ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল যুগের সেক্যুলার মানবতাবাদী ফ্যুয়েরবাখ এবং পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল যুগের ভাববাদী গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি একই ছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তির মালিকানা ও সম্পদ অর্জনের অধিকার এবং মালিক ও শ্রমিকের পার্থক্য শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল, যুক্তিসঙ্গত। মালিকরা যেন সমাজকল্যাণে তাদের উপার্জন 'ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য' নিয়ে বাকিটা সমাজকে দেয়। কোন মানদণ্ডে ঠিক হবে কোনটা মালিকের 'ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য' বা 'ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যের সীমা'? কোনও মালিক কি বলবে সে যা মুনাফা নিচ্ছে, তা 'ন্যায়সঙ্গত' নয়, বা সে 'ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যের সীমা' লঙ্ঘন করছে? পুঁজিবাদী মালিকানা ব্যবস্থাই তো আইন তৈরি করেছে। সেই আইন অনুযায়ী তাদের নেওয়া মুনাফা তো আইনসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত হবেই। আপনারাই বিবেচনা করুন, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাও কি আজকের দিনের পুঁজিবাদসৃষ্ট সংকটের সমাধান কি সম্ভব?

মার্কসবাদী দর্শন আকাশ থেকে পড়েনি

এ থেকেই বোঝা যায়, পুঁজিবাদী শোষণ উচ্ছেদের সংগ্রামে, শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মার্কসবাদের প্রয়োজন কত অপরিহার্য! মার্কসবাদের চিন্তা আকাশ থেকে আসেনি। তা মহান মার্কসের কল্পনাপ্রসূতও নয়। অতীতে দাসপ্রথার যুগে অত্যাচারিত দাসদের কল্যাণে যেমন ধর্মীয় চিন্তা এসেছিল, পরবর্তী ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও ভূমিদাসদের সংগ্রামের প্রয়োজনে যেমন পার্থিব মানবতাবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও জাতীয়তাবাদের চিন্তা এসেছিল, তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষিত শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রয়োজনে আধুনিক বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদ এসেছে। অন্যান্য দার্শনিকেরা যেখানে সত্য চিরন্তন মনে করে সত্য নির্ধারণে নিজের মনে হওয়াকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করেছিলেন, সেখানে একমাত্র মার্কসই সত্য নির্ধারণে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক

বিচারপদ্ধতির ভিত্তিতে তিনি বলেছেন, দুনিয়ায় কোনওকিছুই শাশ্বত নয়, নিরন্তর পরিবর্তনশীল। তিনি দেখিয়েছেন, সত্য সবসময়ই পরিবর্তনশীল, বিশেষ ও আপেক্ষিক। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরীক্ষার মাধ্যমে বারবার প্রমাণ করেছে যে সমগ্র বিশ্ব বস্তুময়, প্রকৃতিবহির্ভূত কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব নেই। বস্তু সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। মাস এবং এনার্জি বস্তুরই দুই ধরনের ফর্ম বা রূপ। একটা অপরটিতে রূপান্তরিত হয় এবং করা যায়। এই বিশ্বের শুরু বা শেষ বলে কিছু নেই। যখন কোনও বিশেষ বস্তু পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন বিশেষ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তখন আপেক্ষিক অর্থে তার শুরু আছে, আবার যখন সেই বিশেষ বস্তু পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন আপেক্ষিক অর্থে তার শেষও আছে। সর্ববৃহৎ গ্রহ থেকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিরন্তর গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা যেহেতু বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নয়, তা কাল্পনিক, সেইহেতু 'এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান ভগবানে' বিশ্বাসী হয়েও নানা ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হানাহানি, রক্তপাত, খুনোখুনি চলছেই। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও আবিষ্কার যেহেতু কারও নিজস্ব ধারণা প্রসূত নয়, পরীক্ষিত ও প্রমাণিত, সেহেতু সেই আবিষ্কার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না। মার্কস বিশেষ বিজ্ঞানগুলির আবিষ্কৃত বিশেষ নিয়মগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট ও কো-রিলেট করে কিছু নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন যেগুলি প্রকৃতি জগৎ ও মানব সমাজের সকল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল, ফলে ইউনিভার্সাল (বিশ্বজনীন)। ফলে মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক দর্শন। মার্কসবাদ আসার পর সমগ্র মানবজাতি এই প্রথম সত্য নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক দর্শনকে হাতিয়ার হিসাবে পেল। বিজ্ঞানীরা যেমন কোনও নিয়ম সৃষ্টি করেননি, যে নিয়ম মানুষের অজ্ঞাতে প্রকৃতি জগতে কাজ করছে মানুষ তা জেনে সচেতনভাবে যাতে নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারে, সেইজন্য আবিষ্কার করছেন — মার্কস আবিষ্কৃত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ নিয়মগুলিও তেমনই পূর্ব থেকেই মানুষের অজ্ঞাতসারেই প্রকৃতিজগতে ও সমাজ জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করেই মার্কস দেখালেন, মানব ইতিহাসের পরিবর্তনও কোনও দৈবশক্তি নির্ধারিত বা কার্যকারণ সম্পর্ক বহির্ভূত হঠাৎ কোন ঘটনা নয়, এটাও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্কস এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন যাতে মানুষ সচেতনভাবে সমাজের অন্তর্নিহিত নিয়মের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত (accelerate) করে সমাজ পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

তিনি দেখালেন, এই নিয়ম অনুসরণ করেই আদিম সমাজ এসেছে যেখানে ধনী ও গরিব ভেদাভেদ ছিল না। স্থায়ী সম্পত্তি আসার পর মালিকানাকে ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণি বিভক্ত সমাজ দাসতন্ত্র, পরবর্তীকালে রাজতন্ত্র, তারপরে পুঁজিবাদ

এসেছে। একই নিয়মে সমাজতন্ত্র এবং পরবর্তীতে আরও বিকাশের পথে সাম্যবাদ আসবে, তারপর আরও উন্নততর সমাজ আসতেই থাকবে। প্রকৃতি জগতে নিয়ম চেতনা নিরপেক্ষভাবে ক্রিয়া করে, মানবসমাজে মানুষের চেতনা সচেতনভাবে এই নিয়মের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, আবার বাধা দিলে বিলম্বিতও করতে পারে। তিনি দেখালেন দাসপ্রথার যুগে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর এ পর্যন্ত সমাজের যত পরিবর্তন ঘটেছে তা শ্রেণি সংগ্রামের ভিত্তিতেই ঘটেছে। ক্ষমতাসীন শোষক শ্রেণি সমাজ পরিবর্তনকে আটকাতে চেয়েছে ফলে তারা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল, আর শোষিত শ্রেণি সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছে, তারা হচ্ছে প্রগতিশীল। এভাবেই দাসরা দাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করেছে, পরে পুঁজিপতিরা ভূমিদাসদের সংগঠিত করে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছে, একইভাবে শ্রমিক শ্রেণিও পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবে। দাসদের আদর্শগত হাতিয়ার ছিল তৎকালীন ধর্মীয় চিন্তা, পুঁজিপতিশ্রেণির আদর্শগত হাতিয়ার ছিল পার্থিব বা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ, যান্ত্রিক বস্তুবাদ, তেমনই শ্রমিকদের আদর্শগত হাতিয়ার হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে মার্কস দেখালেন, সকল সম্পদ এবং এমনকী পুঁজিরও স্রষ্টা মানুষের দৈহিক ও মানসিক শ্রমশক্তি, পুঁজিপতিরা নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি সামাজিক, পণ্যের চরিত্রও সামাজিক হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তিগত, উৎপাদনও করা হয় ব্যক্তিগত মালিকের মুনাফার স্বার্থে। তিনি আরও দেখালেন, শ্রমিককে প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করেই মালিক মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে এই শোষিত জনগণই বাজারের অধিকাংশ ক্রেতা। কিন্তু ন্যায্য মজুরি বঞ্চিত শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা কম থাকার ফলে অনিবার্যভাবে বাজার সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে ক্লোজার, ছাঁটাই, বেকারিত্ব আসতে থাকে, অধিক মুনাফা অর্জনের কম্পিটিশনে অধিক শ্রমিক শোষণ চলতে থাকে। ফলে যে পুঁজিবাদ প্রথমদিকে প্রগতির যুগে শিল্পে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, সেই পুঁজিবাদই পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল যুগে সর্বাত্মক সংকট সৃষ্টি অনিবার্যভাবেই করে যাবে। পরে মহান লেনিন দেখালেন, পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজি, লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে আরও সংকট সৃষ্টি করছে এবং সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে যুদ্ধ, পরদেশ দখল ও লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে, দেশে-বিদেশে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝান্ডাকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু স্তর এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। এর পর মহান স্ট্যালিন দেখালেন চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের স্তরে পুঁজিপতিদের প্রয়োজন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, তার জন্য প্রয়োজন সর্বাধিক শ্রমিক শোষণ ; ভোগ্যপণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হওয়ায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যুদ্ধাস্ত্রের বাজার বা অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে; সামরিক বাজেট বাড়াচ্ছে অন্যান্য বাজেট কমিয়ে ও ট্যাকস্ক বাড়িয়ে পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্বও আর

নেই ; বুর্জোয়াদের কাছে 'স্বাধীনতা'র অর্থ দাঁড়িয়েছে শ্রমিক শোষণের অবাধ স্বাধীনতা, আর শ্রমিক হচ্ছে মনুষ্যদেহী কাঁচামাল। আরও পরে মহান শিবদাস ঘোষ দেখালেন, পুঁজিবাদী বাজারের সংকট, এখন এ বেলা-ও বেলার সংকটে দাঁড়িয়েছে, উন্নত-অনুন্নত সব পুঁজিবাদী দেশেই অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে এবং সব দেশেই পুঁজিবাদ মানবজাতির চরম শত্রু ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে নানা রূপে। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদ 'মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই ধ্বংস করে'। ফলে তিনি দেখিয়েছেন সব পুঁজিবাদী দেশেই এবং আমাদের দেশেও শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধিই নয়, মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধহীনতার সংকটও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনকে কলুষিত করছে, স্নেহ-মায়া-মমতা-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে ধ্বংস করছে। এই ভাবে এঁরা সকলেই পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকট দেখিয়েছেন এবং সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই যে একমাত্র ইতিহাস নির্ধারিত মুক্তির পথ সেটাও দেখিয়েছেন। যেমন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃতি বিজ্ঞান ক্রমাগত উন্নত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে, তেমনি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ও সমাজজীবনে উদ্ভূত নানা নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস-এঙ্গেলস পরবর্তীতে পর পর লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ, শিবদাস ঘোষও মার্কসবাদকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন, যাকে আমরা বলি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। এইভাবেই মার্কসবাদ সমৃদ্ধ ও উন্নত হতে থাকবে এবং মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে একমাত্র এই মহান বৈপ্লবিক মতবাদকে হাতিয়ার করে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারাই বর্তমান সংকটগুলির সমাধান সম্ভব।

আপনারা লক্ষ্য করুন, সুদূর অতীত থেকে মানুষ খাদ্য সহ নানা দ্রব্য উৎপাদন, বাসস্থান নির্মাণ, হাতিয়ার নির্মাণ, যানবাহন নির্মাণ থেকে যা কিছু করেছে সব ক্ষেত্রেই তাদের তৎকালীন বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করেই করতে হয়েছে। এইভাবেই আদিম পর্ব অতিক্রম করেই ধারাবাহিক ভাবে নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে উন্নততর হতে হতে আধুনিক বিজ্ঞান এসেছে এবং ক্রমাগত এগোচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে কৃষিতে, শিল্পে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গৃহনির্মাণে, রাস্তাঘাট ও যানবাহন নির্মাণে, যন্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে, জল, স্থল, ভূগর্ভ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে, এমনকী মহাকাশ অনুসন্ধানে আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে। কিন্তু দর্শন জগতে সত্য নির্ধারণে, ইতিহাসের পরিবর্তনের কারণ নির্ধারণে এবং সামাজিক যেকোন সমস্যা বিচারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক দর্শনের প্রয়োগে বুর্জোয়া শ্রেণি বাধা দিচ্ছে। কারণ তা হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বুর্জোয়ারা বোঝাতে চায়, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং শোষক-শোষিত শ্রেণিভেদ চিরন্তন এবং এর কোন

পরিবর্তন নেই। ফলে যে পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে উৎসাহিত করেছিল আজ সংকটগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল যুগে শ্রমিক বিপ্লবভীত সেই পুঁজিবাদই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আতঙ্কের চোখে দেখছে। তাই তাদের শ্রেণিস্বার্থে জনগণের মধ্যে অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ, শাশ্বততত্ত্ব, অদৃষ্টবাদকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে বিদেশ থেকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে গ্রহণ করছে। এমনকী স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণা, পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি, সংবিধানের শাসন, আধুনিক বিচারব্যবস্থা এগুলির কোনটারই জন্ম বেদ বেদান্ত, কোরান, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারতে নয়, এগুলি সবই এসেছে ইউরোপের নবজাগরণ ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে। কিন্তু এই বুর্জোয়ারাই বলছে মার্কসবাদ বিদেশি, এদেশে চলবে না। অথচ মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হলে আজকের দিনে সংকট থেকে মুক্তির অন্য কোনও পথ নেই।

সমাজতন্ত্রে প্রতিবিপ্লবের বিপদ থাকে কেন এবং একে প্রতিরোধের পথ কী

আপনাদের মনে এই চিন্তা আসা স্বাভাবিক যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও প্রতিবিপ্লবের দ্বারা সেই সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের মতো পুঁজিবাদ আবার ফিরে এসেছে, তা হলে বিপ্লবের পরও সমাজতন্ত্র টিঁকে থাকবে তার গ্যারান্টি কোথায়? মার্কসবাদ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না থাকায় এবং সমাজতন্ত্রের অসাধারণ অগ্রগতি লক্ষ্য করে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, এমনকী কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন অনেকেই এক সময় বিশ্বাস করতেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর আর বিপর্যয় হতে পারে না। কিন্তু কী কী কারণে আবার প্রতিবিপ্লব সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে তার ওয়ার্নিং দিয়ে কীভাবে একে প্রতিরোধ করা সম্ভব সে সম্পর্কে মার্কসবাদী চিন্তানায়করা ইতিপূর্বেই পর্যায়ক্রমে বহু মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছেন। বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে সর্বহারা একনায়কত্ব বা সমাজতন্ত্র কী, এ সম্পর্কে মার্কস বলেছিলেন, এটা হচ্ছে "...পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের মাঝখানে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তরের পিরিয়ড।"[২৯] অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটা অন্তবর্তী স্তর, যার অর্থ হচ্ছে সঠিক রাস্তায় চললে সমাজতন্ত্র সাম্যবাদে পৌঁছাবে, আর বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারলে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। আরেক জায়গায় আরও সুস্পষ্টভাবে বলছেন, প্রথম দিকে সাম্যবাদের প্রথম স্তর অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, ..."নিজস্ব ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি, বরং যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্য থেকে এর জন্ম (emerge) হয়েছে, তার ফলে অর্থনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিগত (intellectually) সর্বদিক থেকে এটা যে পুরাতন সমাজের জঠর থেকে এসেছে

সেই সমাজের জন্মচিহ্ন (birthmark) বহন করে"।[৩০] কতটা দূরদৃষ্টি থাকলে মার্কস তখন বলতে পেরেছিলেন, সমাজতন্ত্রের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভাবগত, অর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রভাব থাকে এবং সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী স্তর। বিপ্লব সফল করার পর লেনিন বলেছিলেন, "এই অন্তর্বতী স্তর হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও সদ্যোজাত সাম্যবাদের সংগ্রামের পর্যায় বা অন্য কথায় বলতে গেলে এই সংগ্রাম হচ্ছে যে পুঁজিবাদ পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস হয়নি এবং যে সাম্যবাদ জন্ম নিয়েছে কিন্তু খুবই দুর্বল, এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম"। [৩১] তিনি আরও বলেছেন, "নতুন শ্রেণিকে (বিজয়ী শ্রমিক শ্রেণিকে) অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালাতে হবে খুবই শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যার শক্তি দশগুণ বেড়ে গেছে (এমনকী শুধুমাত্র একটি দেশ হওয়া সত্ত্বেও)। এ ছাড়া এই ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াদের শক্তির উৎস শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পুঁজিই নয়, ...এদের ক্ষমতার উৎস দেশের অভ্যন্তরের অভ্যাসের শক্তি (force of habit) এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তি"। [৩২] বলেছেন, "কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের শক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক ... ক্ষুদ্র মালিকানা প্রতি দিন প্রতি ঘন্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুর্জোয়াদের জন্ম দেয়।" [৩৩] আপনাদের জানা দরকার, বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় দীর্ঘদিন বাস্তব কারণেই ক্ষুদ্র মালিকানা নানারূপে ছিল। অন্যদিকে সমগ্র জনগণ যতদিন মার্কসবাদী না হচ্ছে, ততদিন তাদের মধ্যে নানারূপে অমার্কসবাদী বা বুর্জোয়া চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকে। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ ব্যাপকভাবে সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করলেও তারা মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে তাদের চিন্তা-সংস্কৃতিতে, জীবনযাত্রায় বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শন নানা রূপে কাজ করে গেছে, সচেতন না থাকায় স্বাভাবিকভাবে দলের বহু সদস্য এবং এমনকী বেশ কিছু নেতার মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছিল।

এবার স্ট্যালিন কী বলেছেন, দেখুন। তিনি ১৯২৯ সালে বলেছেন, "সমাজতন্ত্রের যত অগ্রগতি ঘটছে, তত শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে।"[৩৪] মৃত্যুর আগে ১৯৫২ সালে ১৯তম পার্টি কংগ্রেসে বলেছেন,"আমাদের দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েট রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায়নি, দেশের অভ্যন্তরে থেকে এরা এবং বাইরের থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলি সমাজতন্ত্র বিরোধী চিন্তা, ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছে। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদের সমাজে যারা দোদুল্যমান (unstable) তাদের নষ্ট (corrupt) করার জন্য এরা অস্বাস্থ্যকর (unhealthy) ভাবধারা ও সেন্টিমেন্ট প্রচার করছে। ...আমাদের দেশে এখনও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ (vestiges) রয়েছে, ব্যক্তিগত মালিকানার মানসিকতা ও নৈতিকতার অবশেষ (relics) রয়েছে। এইগুলি আপনা থেকে ধ্বংস হয় না, তা আঁকড়ে টিঁকে থাকার (very tenacious) ভীষণ ক্ষমতা রাখে এবং নিজেদের অবস্থান (hold) শক্তিশালী করতে পারে, ...

...আদর্শগত যে সব ক্ষেত্রে পার্টির নেতৃত্ব ঢিলেমি দিচ্ছে, সেখানে লেনিনবাদ-বিরোধী গ্রুপ জায়গা করে নিচ্ছে এবং নিজেদের রাজনৈতিক লাইন প্রচার করছে। আদর্শগত সংগ্রাম পার্টির প্রধান কাজ, এর গুরুত্ব খাটো করে দেখলে দল ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আমাদের সব সময় স্মরণে রাখতে হবে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব দুর্বল হলে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব শক্তিশালী হবে।"[৩৪] যে সময় স্ট্যালিন এই বক্তব্য রেখেছেন, সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্ট্যালিন বিশ্বে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত এবং যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও পুনর্গঠনে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও বহু ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত গভীর উদ্বেগে এ কথাগুলি বলেছিলেন এবং একদল নেতার মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব লক্ষ করে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এটা নিশ্চিত, তিনি বেঁচে থাকলে এইসব বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতেন, যেমন লেনিনের মৃত্যুর পর বার বার সমাজতন্ত্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে বুর্জোয়া শ্রেণির এজেন্ট সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব স্ট্যালিনের এই ওয়ার্নিংগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া দূরের কথা, বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই অথরিটিকে আঘাত করে সংশোধনবাদী পথে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দিল। ১৯৫৬ সালে ২০তম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিনবিরোধী আক্রমণ প্রসঙ্গে এই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। মহান মাও সে-তুঙ-ও মৃত্যুর আগে চীনে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করে বলেছিলেন, "বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করার পরও পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য জনগণের মানসিকতা নষ্ট (corrupt) করার উদ্দেশ্যে শোষক শ্রেণি পুরনো ভাবনা, সংস্কৃতি, অভ্যাস ও আচরণকে ব্যবহার করছে। ...বর্তমানে আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে, (রাষ্ট্র ও পার্টির) ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, যারা পুঁজিবাদী রাস্তা গ্রহণ করেছে। ...যেহেতু সাংস্কৃতিক বিপ্লবও এক ধরনের বিপ্লব, তার ফলে অনিবার্যভাবে বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিরুদ্ধতা আসছে প্রধানত তাদের কাছ থেকেই যারা পার্টির অভ্যন্তরে ঢুকে ক্ষমতাসীন হয়ে পুঁজিবাদী রাস্তায় চলছে।"[৩৬] তাঁর মৃত্যুর পর এই পুঁজিবাদী রাস্তা অনুসরণকারীরাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

সর্বশেষ এই প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের কিছু মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের স্মরণ করানো দরকার। ১৯৪৮ সালে পার্টির প্রতিষ্ঠার বছরই তিনি গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন, "বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু সফলতা ও গৌরবময় আত্মত্যাগকে যথাযথ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও আমরা এর

গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি। ...এই গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখা দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের বর্তমান নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। ...যার ফলে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্কসীয় বিজ্ঞানে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়েছে তা কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। ...”[৩৭] এর জন্য চেতনার নিম্নমানকে দায়ী করে পরে তিনি বলেছিলেন, “...কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতি ঘটে গেল অথচ তা সত্ত্বেও তার চেতনার মানটা পিছিয়ে পড়ল— এ আজ নতুন ঘটেছে এমন নয়। লেনিন তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই এই দিকটার উপর জোর দিয়েছিলেন। ...লেনিন পরবর্তীকালে মানবজীবনে এবং শ্রেণি সংগ্রামের সামনে যে বহু নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনগত উপলব্ধির যে বিকাশ ঘটানো উচিত ছিল, লেনিনের পর তা আর করা হয়নি।...আদর্শগত দিক থেকে ব্যক্তিবাদ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা আজ অগ্রসর দেশগুলিতে শ্রেণিসংগ্রামের পথে একটা বাধা। এই পরিস্থিতিতে, মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং সর্বহারা মূল্যবোধের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা জরুরি প্রয়োজন ছিল। ...যারা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনা শর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সেই হচ্ছে সত্যিকারের কমিউনিস্ট— এটাই ছিল এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সর্বোচ্চ মান। কালিনিনের ‘কমিউনিস্ট এডুকেশন’ বইয়ে এটাকেই সত্যিকারের কমিউনিস্ট চেতনার উন্নত মান বলা হয়েছে। কিন্তু, আজকের এই নতুন পরিস্থিতিতে এটার আর সত্যিকারের উঁচু দরের কমিউনিস্টের মান বা স্তর থাকতে পারে না। ...ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নতুন জটিল স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে— যেখানে এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নিরন্তর সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেওয়ার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের এ এক নতুন মান, যেটা পুরনো বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ, যা এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।”[৩৮] তিনি বলেছেন, “এটা না করতে পারায় ‘সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ’ জন্ম নেবে এবং তার থেকে ক্রমাগত দাবি উঠবে যে, ব্যক্তির অধিকার আরও বাড়াতে হবে। আর এইভাবে চলতে থাকলে পুনরায় তা সংশোধনবাদের জন্ম দেবে এবং পুঁজিবাদকেই ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।”[৩৯] তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক মালিকানার অনেক অগ্রগতির পরও, “...সেখানে যৌথ খামার প্রথা রয়েছে, যেমন

পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন ব্যক্তি সম্পত্তির অস্তিত্ব— বাড়িঘর, টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্কে জমানো এগুলি রয়েছে, ল-অফ ভ্যালু রয়েছে। এইসব জিনিসগুলির মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বীজ সেখানে নষ্ট হয়ে যায়নি। এবং যতদিন তা থাকে অর্থনীতিতে সমাজ অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের ঝোঁক ততদিন থাকে। ...কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদনগুলিই আপনা-আপনি সংশোধনবাদ এনে দেয়নি, এটা আনবার মতো শক্তিই তার ছিল না, রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমান এই প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিল। ...একে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পার্টির অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে চেতনার উন্নত মান বজায় রাখা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয়, দর্শন ও বিজ্ঞান জগতে নতুন করে যে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মার্কসবাদের ক্রমাগত সমৃদ্ধি ঘটানো। সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুন্নত মান থাকলে তার দ্বারা সমস্ত পার্টিটা, সমস্ত শ্রমিক শ্রেণি বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের রাস্তায় পুরোপুরি পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনতে পারে।” [৪০]

এতক্ষণ ধরে পর পর মহান মার্কস থেকে শুরু করে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধকরা কীভাবে নতুন নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কী কী কারণে সমাজতন্ত্র পাল্টে পুনরায় পুঁজিবাদ ফিরে আসতে পারে এবং কীভাবে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব সে সম্পর্কে ধারাবাহিকতায় কী কী বলেছেন, আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম এবং আপনারাও ধৈর্য ধরে তা শুনেছেন। আপনারা দেখলেন, সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় মার্কসবাদী চিন্তানায়কদের কাছে অভাবিত ছিল না। বরং তাঁরা এই সম্পর্কে ওয়ার্নিং দিয়েছেন এবং সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করার পথও দেখিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী নেতৃত্ব সেগুলির গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং অধঃপতিত হয়ে তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে সংশোধনবাদী পথে চলার ফলেই প্রতিবিপ্লব সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পেরেছে। এটা আমাদের কাছে এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা, আবার একটা মূল্যবান শিক্ষাও।

সঠিক শিক্ষা নিয়ে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই পুনরায় সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হবে

এটাও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে, যে কোনও নতুন আদর্শ, যে কোনও নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জয়যুক্ত করার জন্য শত শত বৎসর রক্তক্ষয়ী লড়াই চালাতে হয়েছে জয়-পরাজয়ের পথে। যে ধর্মকে দাবি করা হয় ভগবৎ শক্তিতে বলীয়ান, সেই ধর্মকেও চূড়ান্ত জয়ের জন্য জয়-পরাজয়ের পথে শত শত বৎসর লড়তে হয়েছে। প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। একইভাবে

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রেনেসাঁস থেকে শুরু করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেও চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য প্রায় ৩৫০ বছর লড়াই করতে হয়েছে। যদিও এই দুইটি লড়াই শ্রেণিশোষণের অবলুপ্তির সংগ্রাম ছিল না, ছিল একটা শ্রেণিশোষণের পরিবর্তে আরেকটি শ্রেণিশোষণ কায়েম করার সংগ্রাম। তা সত্ত্বেও এত শত বছর ধরে লড়তে হয়েছে। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে দাস প্রথা থেকে রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পর্যন্ত কয়েক হাজার বছরের শ্রেণি শাসন ও শোষণের অবলুপ্তির বিপ্লব, সেই অর্থে রাশিয়ায় ৭০ বছরের সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বের শক্তি কতটুকু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বেষ্টিত দুনিয়ায়! ফলে হতাশার কোনও কারণ নেই। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে এবং তাকে রক্ষা করতে হবে। যেমন ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণি রক্তাক্ত লড়াই করে পুঁজিপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু কয়েক মাস বাদেই পুঁজিপতিরা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে এবং হাজার হাজার শ্রমিককে হত্যা করে। মার্কস এর থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন যে, শুধু পুঁজিপতিদের ক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দিলেই হবে না, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে নতুন শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। লেনিন এই শিক্ষাকে রাশিয়ার বিপ্লবে কার্যকরী করেছিলেন। আমরা যারা পরবর্তীকালে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলব, তারা মহান মার্কসবাদী শিক্ষকদের অমূল্য শিক্ষাগুলি স্মরণে রেখে বিপ্লবকে সফল করাই শুধু নয়, রক্ষাও করব, যাতে পুঁজিবাদ ফিরে না আসতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে, সমাজতন্ত্রে শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তনই নয়, সুপারস্ট্রাকচার বা উপরকাঠামোতেও বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে আলাদাভাবে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক শ্রেণি সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। না হলে সেখান থেকে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ আসবে এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের নিয়মেই সমাজতন্ত্র এসেছে, আবার মার্কসবাদী শিক্ষকদের মূল্যবান ওয়ার্নিং ও শিক্ষাগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ও গুরুতর ভুল-ভ্রান্তি হওয়ায় পুঁজিবাদ পুনরায় ফিরে আসতে পেরেছে। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মেই পুনরায় সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়ে আসবে ও টিকে থাকবে। এ ছাড়া মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ কী? সমাজতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর আজ পুঁজিবাদী রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের কোটি কোটি জনগণ দারিদ্র, বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি সহ বিবিধ সংকটে জর্জরিত হয়ে হাহাকার করছে, পুনরায় সমাজতন্ত্র ফিরে পাওয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছে। অনিবার্য নিয়মে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে মানে আপনা থেকেই হবে, তা নয়, সংকটে জর্জরিত মানুষ অনিবার্যভাবে মুক্তির পথ খুঁজবে, মার্কসবাদীরা পথ দেখাবেন এবং শোষিত জনগণ সচেতনভাবে ক্রিয়া করে পরিবর্তনের নিয়মের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে, অর্থাৎ বিপ্লব সংঘটিত করবে। এই প্রক্রিয়া যত বিলম্বিত হবে, সংকট তত বাড়তেই থাকবে।

মহান স্ট্যালিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদানকে সেদিন বিশ্বের বড় মানুষরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন

মনে রাখবেন, লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র অসাধারণ অগ্রগতি ঘটিয়ে মানব ইতিহাসে প্রথম শোষণমুক্ত যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা প্রত্যক্ষ করে মার্কসবাদী না হয়েও বিংশ শতাব্দীর বরেণ্য মানবতাবাদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, ইউরোপের রমাঁ রলাঁ, বার্নাড শ, আইনস্টাইন, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মণম ভারতী এবং বহু প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতার শোচনীয় পরিণতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একমাত্র আশার আলো গণ্য করে গভীর শ্রদ্ধায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মনীষী রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, "আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য ও কর্মে বিশ্বাসী। যতদিন বেঁচে থাকব, তার পক্ষে কাজ করে যাব।"[৪১] বিশ্বখ্যাত বার্নাড শ বলেছিলেন, "পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একটি দেশেই আছে, সেটি হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে মহান স্ট্যালিন বেঁচে আছেন।"[৪২] এবার শুনুন, অন্য কয়েকজন বড় মানুষের কথা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সৃষ্ট নতুন সভ্যতার অগ্রগতি দেখে কি বিপুল ভরসা করে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে মুগ্ধ চিত্তে লিখেছেন, "...মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড এক বিপ্লবের ওপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব — এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ...নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে, যেটাকে বলে লোভ। প্রার্থনা আপনি জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক"।[৪৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ফ্যাসিস্ট শক্তির আক্রমণে সমগ্র মানব সভ্যতা বিপন্ন, তখন মৃত্যুশয্যায় রবীন্দ্রনাথ ত্রাতা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকেই গণ্য করেছিলেন। সেই সময় তাঁর দেখাশুনা করছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি লিখছেন "জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বার বারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়ায় কি হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, 'সবচেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে।' সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, খুব ম্লান হয়ে যেতেন, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। যেদিন অপারেশন করা হয়, সেদিন সকালবেলায় অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা — 'রাশিয়ার খবর বলো', বললুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, 'হবে না? ওদেরইতো

হবে। পারবে, ওরাই পারবে।"[৪৪] (তথ্যসূত্র ঃ কবিকথা, প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবিশ, বিশ্ববাণী পত্রিকা, ১৩৫০) স্ট্যালিন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কতটা আস্থা রবীন্দ্রনাথের ছিল! দুঃখের বিষয়, তিনি সোভিয়েত ইউনেয়নের যুদ্ধজয় দেখে যেতে পারেন নি। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শরৎচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ছোট্ট কথায় গান্ধীজির মূল্যায়ন করে বলেছিলেন, "তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধণিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে। এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।"[৪৩] নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে তিনি শ্রমিকদের পুঁজিবাদী সভ্যতার ধ্বংসের আহ্বান জানিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বলেছিলেন, " আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা— তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।" সেই যুগের বিপ্লবীদের শ্রমিক বিপ্লবের অপরিহার্যতা বোঝাবার জন্য শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' উপন্যাসে শ্রমিকদের বলেছিলেন, " ... এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই— হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ কোনও কিছুই নেই— আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক। তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত আতঙ্কের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকায়ে যায়।... তাই তোমাদের জীবন ধারণটুকুর বেশি তিলার্ধ যে তাঁরা স্বেচ্ছায় কোনওদিন দেবে না— এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি এতই কঠিন?... জনকতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্য পথের দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এমন করে এদের ভাল করা যায় না— এদের ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।" আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করার সময় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছিল, "Towards the end of the book the hero works himself upon a state of frenzy, throws away all restraints and preaches pure Bolshevism."[৪৫] এই শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের আর্ট ও দুর্নীতি' নিবন্ধে বলেছেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী তামিল সাহিত্যিক সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লিখেছিলেন, "It appears as if the Socialist Party (communist party) in Russia would achieve its objectives. ... The main principle of this party is to change the present property ownership by which a few are

wealthy and many are poor. ..."[৪৬] আরেকজন দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচন্দও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রশংসা করে লিখেছেন, "সোভিয়েত রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল আশাতীত হচ্ছে। ... যেখানে মানুষের শাসনব্যবস্থা মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয় সেখানে এই সাফল্যই অর্জিত হয়। ... রাশিয়া একাগ্র চিত্তে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সেখানে বেকারীত্ব নেই, বাণিজ্যে মন্দাও নেই।" (সোভিয়েত রাশিয়ায় উন্নতি) আর সেই যুগের বাংলার সংগ্রামী কবি নজরুল ইসলাম কাব্যিক ভাষায় রাশিয়ার বিপ্লবের প্রশংসা করে লিখেছেন, "দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণ-তন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলো। জার গেল — জারের রাজ্য গেল —ধনতান্ত্রিক প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। কার্ল মার্কসের ইকনমিকসের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্ক লক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তুপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যপ্ত করে ফেলেছে।"[৪৭] কবি নজরুল ইন্টারন্যাশানাল সংগীতের অনুকরণে একটি সংগীতও রচনা করেছিলেন।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে শহিদ-এ-আজম ভগৎ সিং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে মার্কসবাদী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩০ সালে ২১শে জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যুদিবসে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাথীদের নিয়ে স্লোগান তুললেন, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ', 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানাল জিন্দাবাদ', 'মহান লেনিন অমর রহে'। তার পর তিনি একটি লিখিত বিবৃতি পড়লেন, তাতে আছে, "আজ, লেনিন দিবসে, আমরা তাঁদের সকলকেই আমাদের হৃদয়ের অভিনন্দন পাঠাই যাঁরা মহান বিপ্লবী লেনিনের নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে, কিছু না কিছু কাজ করে চলেছেন। রাশিয়ার বুকে এগিয়ে চলা সামাজিক, অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলিরও সঙ্গে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করি। সর্বহারার জয় অবধারিত। পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুও আসন্ন।" ফাঁসির আগে এক চিঠিতে সহযোদ্ধা ও শহিদ শুকদেবকে ভরসা দিয়ে লেখেন, "You and I may not live but our people will survive. The cause of Marxism and communism is sure to win."[৪৮]

নেতাজি সুভাষচন্দ্রও মার্কসবাদ ও সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন, "ঊনবিংশ শতকে জার্মানি তাহার মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্ব সভ্যতাকে দান করেছিল, বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা সরকার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে"। [৪৯] ১৯০৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি

গভীর ভরসা ব্যক্ত করে বলেছিলেন "Against this background of unrest stands Soviet Russia, whose very existence strikes terror into the heart of the ruling classses in every imperialist state."[৫০] (Crossroads) আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন গভীর উদ্বেগে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজী বলেছিলেন, "The so-called democratic powers, France and Great Britain have joined Italy and Germany in conspiring to eliminate Soviet Russia from European politics, for the time being. But how long will that be possible?"[৫১] (Crossroads) আই এন এ বাহিনী পরাস্ত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ২৫শে মে সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি আশার বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন, "আজ যদি ইউরোপে এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত, তবে তিনি হলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করে না করে তাহার দিকে সর্বাধিক উদ্বেগ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে... যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে একটি শক্তিই আছে যার নিজস্ব পরিকল্পনা আছে এবং যে পরিকল্পনা প্রয়োগ করার যোগ্য, সেই শক্তি হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে, তাকে গ্রহণ করা ব্যতীত ইউরোপীয় দেশগুলির বিকল্প অন্য কোন পথ নেই।"[৫২] সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কতটা আস্থা থাকলে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েও নেতাজী এই আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। অথচ এটা বোঝার মত মানসিকতা আজ এদেশে কয়জনের আছে! আজকাল বুদ্ধিভ্রষ্ট, টাকায় বিক্রি হওয়া যে-সব বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ও মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তারা কি যথার্থ বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক? নাকি উপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁরাই যথার্থ বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক? আপনারা বিচার করে দেখুন।

সেই সময়ে বিশ্বে এমন কোনও বরেণ্য সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন না, মতবাদিক পার্থক্য সত্ত্বেও যাঁরা স্ট্যালিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করেননি। ১৯৫৬ সালে বুর্জোয়া এজেন্ট ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যখন এই মহান নেতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করল সেই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছিলেন, "...তাঁর পূর্বসূরী মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের মতো স্ট্যালিনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একজন অথিরিটি। তাই স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য পরিণাম হল তাঁর অথরিটিকে অস্বীকার করা, যার অর্থ লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি — যেটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আজকের দিনের সঠিক উপলব্ধি — তাকেই অস্বীকার করা। ...এর দ্বারা মার্কসবাদ-

লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তা-ভাবনা আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[৫৩] বাস্তবে ঘটলও তাই। তাই আজ মার্কসবাদ প্রচার ও গ্রহণের সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার সংগ্রাম এবং মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার পরাস্ত করে তাঁকে যথার্থ মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

সমাজতন্ত্রের পতন থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব

আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, মনীষী রমাঁ রলাঁ, একদিন গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন, "যদি সোভিয়েত গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যায় ...শুধু পৃথিবীর সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিণত হবে না, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি হবে। ...কয়েক শতাব্দীর মতো সেখানে অন্ধকার গভীর হয়ে নেমে আসবে।" [৪১] এটাই আজ মর্মান্তিক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সব দেশে, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে গভীর অন্ধকার গ্রাস করেছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ পচা-গলা দুর্গন্ধময় মৃতপ্রায় শবদেহের মতো জীবনকে সর্বদিক থেকে দূষিত ও দুঃসহ করে তুলেছে। এইভাবে চলতে থাকলে এই সংকট আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। একমাত্র আশার আলো বৈজ্ঞানিক মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা এবং এই অমোঘ হাতিয়ারে শিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে হলে দেশে দেশে এই বিপ্লবকে অবশ্যই সফল করতে হবে। আমরা আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার দ্বারা অন্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকেও অনুপ্রাণিত করতে পারি। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত আমাদের দলের উপরই আজ এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে। একবার স্মরণ করুন, এই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য নিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষ কত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কী কঠোর ও কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে এই দলটি গড়ে তুলেছেন! আমাদের এই প্রিয় দলকে সংহত, বিস্তার ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আজকের পরিস্থিতি সেদিনের তুলনায় কত অনুকূল! কীভাবে আমরা আমাদের উপর ন্যস্ত এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারি, সেই সম্পর্কে আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি মূল্যবান আহ্বান স্মরণ করাতে চাই। তিনি বলেছেন, "...ভারতবর্ষের সমাজ মুক্তিযন্ত্রণায় ছটফট করছে। ... মানুষ পরিবর্তন চাইছে। পুরনো সমাজের মিলিটারির তাগদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া শাসক গোষ্ঠীর নির্ভর করার মতো আজ আর কিছু নেই। আর, তারা নির্ভর করছে মানুষের অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির ওপর— কিন্তু এটা খুব বড় নয়। ...শুধু মানুষের সংগঠিত সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের অভাব আর যতটুকু ন্যূনতম শক্তি হলে জনতাকে ...একটা সংগঠিত লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া যায়, ততটুকু শক্তি সম্পন্ন একটা সত্যিকারের বিপ্লবী দলের অভাব।

...আগামী সময়টা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্টিটাকে দ্রুত অতি অল্প সময়ে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। আগে, ভাবলেও, আমরা এ কাজ পারতাম না। কিন্তু এখন আমাদের যা সংখ্যা, তাতে আমরা প্রতিটি নেতা ও কর্মী যদি ভেবে এটাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি তা হলে আমরা এ কাজ করতে পারি। তার জন্য প্রত্যেকটি নেতা ও কর্মীকে তাঁদের আপন উদ্যোগ এবং বুদ্ধি অনুযায়ী— পারুন বা না পারুন, সফলতা হোক, বিফলতা হোক— কর্মবিমুখ না হয়ে কাজ করে যেতে হবে।" [৪২] আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী ও নেতা এই আহ্বানের মর্যাদা দিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। আর যে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও দরদি জনগণ এই সমাবেশে উপস্থিত আছেন তাঁরাও এই দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সাহায্য দেবেন। এটাই হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

আমি সভার শুরুতেই বলেছি, অন্য কোনও সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে আজকের সভায় আলোচনা করব না। প্রাসঙ্গিক মনে করে কিছু জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা করি আপনারা গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখবেন।

তথ্যসূত্র

১ — শিবদাস ঘোষ, গণআন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে
২, ৬, ৯,১০ — শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি-২য় খণ্ড
৪, ৫ — মার্কস-এঙ্গেলস ধর্ম প্রসঙ্গে
৭ — মার্কস, ক্যাপিটাল, ভল্যুম -১
৮ — লেনিন, ফিলজফিক্যাল নোটবুক
৯ — শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি-৪র্থ খণ্ড
১১ — বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ
১৩ — এঙ্গেলস অন হেগেল
১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯ — বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা
১২, ২০ — বিবেকানন্দ, অদ্বৈত বেদান্ত
২১ — গান্ধীজি, মাই রিলিজিয়ন
২২, ২৩, ২৪ — গান্ধীজি, সোস্যালিজম অফ মাই কনসেপশান
২৫, ২৬, ২৭, ৪৩ — রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি
২৩ — রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ১১ খণ্ড
২৯ — মার্কস, দ্য ক্রিটিক অফ দি গোথা প্রোগ্রাম
৩১ — ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দি এরা অফ দি ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট
২৮, ২৯ — লেফট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিজর্ডার
৩০ — প্রবলেমস অফ লেনিনইজম
৩১ — লেনিন, সর্বহারা একনায়কত্বের যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতি
৩২ — সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত

৩৪, ৩৫, ৩৬ — সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের রিপোর্ট
৩৭, ৩৮ — শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি - ১ম খণ্ড
৩৯, ৪০, ৫২ — শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি - ১ম খণ্ড
৪১, ৪২ — রমা রঁল্যা, শিল্পীর নবজন্ম
৪৩ — শরৎচন্দ্র, বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ
৪৪ — কবিকথা, প্রশান্তচন্দ্র মহলনাবিশ
৪৫ — নিউ স্টেটসম্যান অ্যান্ড নেশন পত্রিকা
৪৬ — সুব্রহ্মমন্য ভারতী, স্বদেশ মিত্রম
৪৯, ৫০, ৫১ — সুভাষচন্দ্র বসু, ক্রসরোডস্
৫২ — শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশানাল প্ল্যান গ্রন্থে উদ্ধৃত